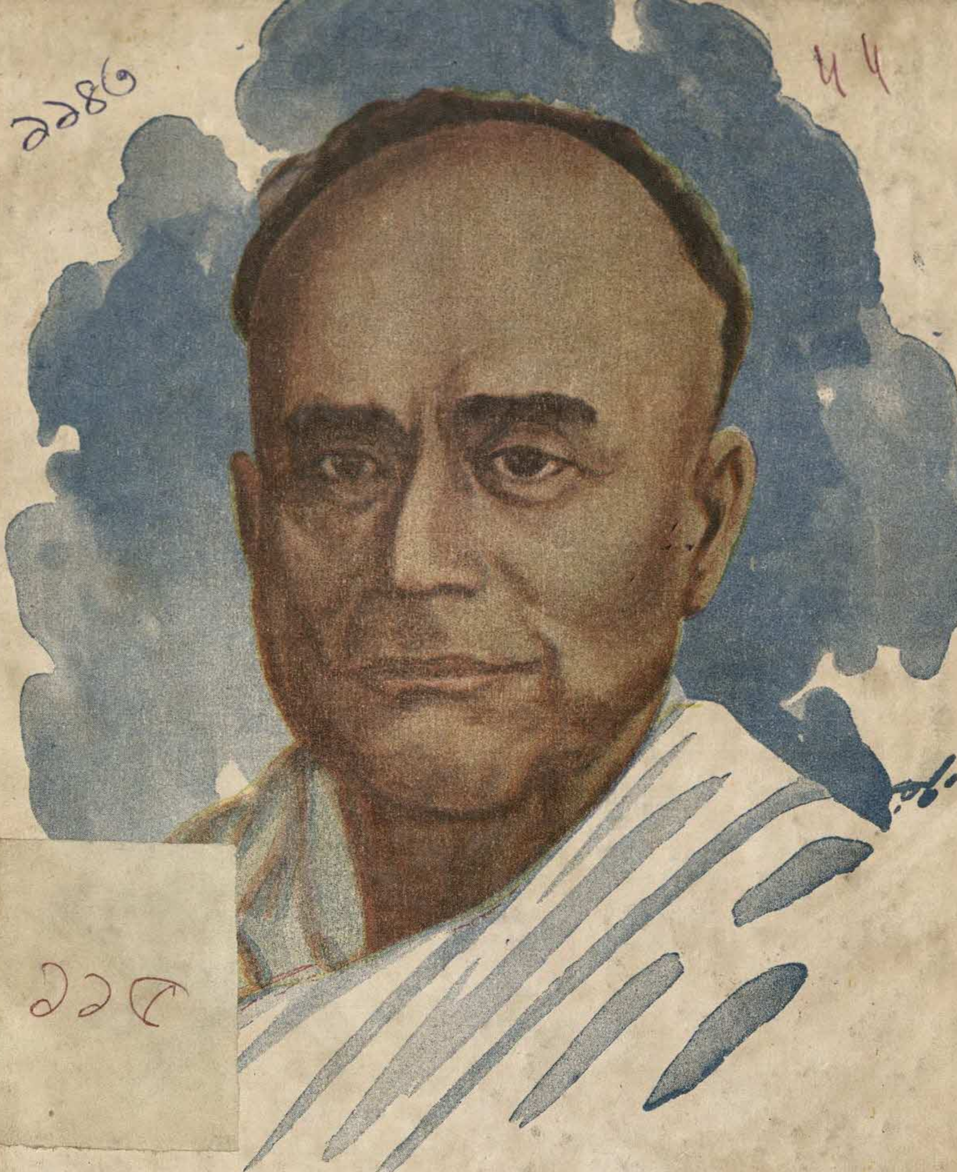


আমাদের বিদ্যাসাগর



আমাদের বিদ্যাসাগর

রবিদাস সাহারায়

দেবসাহিত্য কুটীর
কলিকাতা

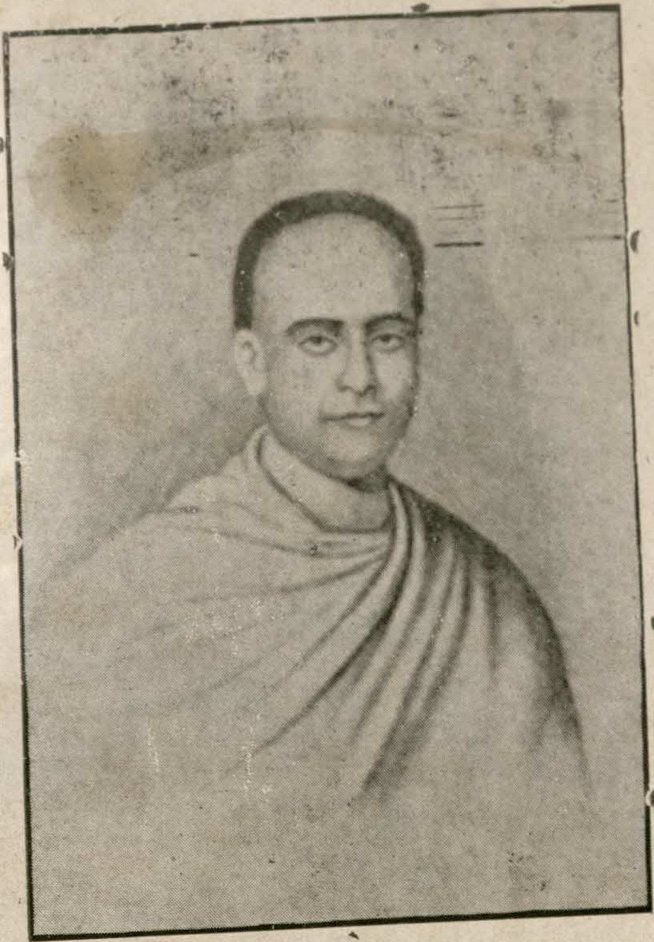
প্রকাশ করেছেন—
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা-৯

এপ্রিল
১৯৮৫
৪

ছেপেছেন—
বি· সি· মজুমদার
দেব প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা-৯

দাম—
টা· ১০·০০

উপহার



তরুণ বয়সে—ঈশ্বরচন্দ্র

এক

ইস, দু মুঠো ভাতের জন্য এত অপমান!

আর সহ্য হয় না। এ সংসার আর নয়!

রামজয় চলে গেলেন বাড়ি ছেড়ে। পড়ে রইলো বউ ছেলেমেয়ে। সেদিকে ফিরেও তাকালেন না।

গাঁয়ের সবাই ছিঃ ছিঃ করতে লাগলো। পণ্ডিত মানুষের এই কাণ্ড! দুর্গা প্রতিমার মত বউ দুর্গাদেবী। তার ওপর একটি দুটি নয়, ছ'টি নাবালক ছেলেমেয়ে। এদের দেখবে কে?

হুগলী জেলার বনমালীপুর একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম।

এই গ্রামের বন্দ্যোপাধ্যায়রা বংশানুক্রমে পণ্ডিত। সেই বংশের ভুবনেশ্বর তর্কালঙ্কারকে সবাই সম্মান করে। এমন জ্ঞানী ও এমন সজ্জন লোক সচরাচর দেখা যায় না।

তাঁর পাঁচ ছেলে। নৃসিংহরাম, গঙ্গাধর, রামজয়, পঞ্চানন ও রামচরণ।

তৃতীয় ছেলে রামজয়ের প্রকৃতি যেন কেমন ধরনের।

বিদ্যায় সুপণ্ডিত, রূপে সুপুরুষ। কিন্তু খামখেয়ালী আর অভিমানী।

একান্নবর্তী পরিবার। সংসারের আয় কম। তাই টানাটানি লেগেই থাকে। এই নিয়ে অনেক সময় মেয়েদের মধ্যে নানারকম কথা হয়। পুরুষদের মধ্যেও তা নিয়ে আলোচনা চলে।

একদিন ভাইদের সঙ্গে রামজয়ের কি নিয়ে তর্ক হলো। নিজের রোজগার কম, তাই আত্মসম্মানে ঘা লাগলো তাঁর। চলে গেলেন সংসার ছেড়ে। স্ত্রী আর নাবালক ছেলেমেয়েদের কথা মোটেই ভাবলেন না।

দুর্গাদেবী খুবই বিপদে পড়লেন। কিছুদিন নানা গঞ্জনা সহ্য করেও পড়ে রইলেন শ্বশুরবাড়ির ভিটায়। কিন্তু যখন আর সহ্য করতে পারলেন না তখন ছেলেমেয়েদের নিয়ে চলে গেলেন বাপের বাড়ি বীরসিংহ গ্রামে।

হুগলী থেকে এলেন মেদিনীপুরে।

বাবা উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত একজন নামকরা পণ্ডিত। সংসারে সচ্ছলতা না থাকলেও অভাব অভিযোগ খুব ছিল না। পিতৃগৃহে দুর্গাদেবীর দিনগুলি মোটামুটি ভালই চলতে লাগলো।

কিন্তু কিছুকাল পরই অবস্থার পরিবর্তন ঘটলো। উমাপতি বৃদ্ধ হয়েছেন।

তাই সংসারের ভার এসে পড়লো জ্যেষ্ঠ পুত্রের ওপর। তখন পুত্রবধূই হলেন সংসারের কর্ত্রী।

কিছুকাল পরই দুর্গাদেবী ও তাঁর ছেলেমেয়েদের ওপর দুর্ব্যবহার চলতে লাগলো। উমাপতি সবই বুঝতে পারলেন কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলেন না।

দুর্গাদেবীর জীবন ধীরে ধীরে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। তিনি বুঝতে পারলেন, যে আশা নিয়ে এসেছিলেন তা দুরাশা মাত্র। ছেলেমেয়েদের হাত ধরে আবার তাকে পথে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু কোথায় যাবেন? তাই বাবাকে একদিন বললেন—বাবা, আর তো এখানে থাকা চলে না।

উমাপতি বললেন—তা তো বুঝতে পারছি মা। কিন্তু কি করবো। জামাইটা যে কি মানুষ, কোন খোঁজখবরই দিল না। তোর ভাগ্যে যে কি আছে কে জানে?

দুর্গাদেবী বললেন—কাছাকাছি কোথাও তুমি একটা চালাঘর তুলে দাও বাবা। সেখানেই আমি ছেলেমেয়েদের নিয়ে কোনরকমে থাকবো।

—তা না হয় দিলাম, কিন্তু তোদের চলবে কি করে? তোর একটা পেট তো নয়।

—চরকায় সুতো কাটবো। একবেলা কোনরকমে দুটো শাক-ভাত জুটলেই চলবে।

উমাপতি ভেবে দেখলেন, তবু যা হোক মেয়েটা চোখের ওপর থাকবে। তাই কিছুদিন পরই তাঁর বাড়ির একটু দূরে একটি চালাঘর তৈরি করে দিলেন।

সেখানেই দুর্গাদেবী ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাস করতে লাগলেন।

সেই সময়ে তকলি ও চরকায় সুতা কেটে, সেই সুতা বেচে অনেক গরিব পরিবার কোন রকমে জীবিকা নির্বাহ করতো। দুর্গাদেবীও তাই করতে লাগলেন। কিন্তু এতগুলো ছেলেমেয়ে ও নিজের অন্ন-সংস্থান করা সহজ কথা নয়। কাজেই তাঁর দুঃখ ও পরিশ্রমের অন্ত ছিল না।

ছেলেমেয়েদের মধ্যে সব চেয়ে বড় ঠাকুরদাস। তাঁর বয়স তখন চৌদ্দ পনেরো বছর।

মায়ের ও ভাইবোনদের দুঃখ-দুর্দশা দেখে ঠাকুরদাসের মন ব্যথায় ভরে উঠলো। তিনি স্থির করলেন যে ভাবেই হোক কিছু টাকা রোজগার করতে হবে। সংসারের দুঃখের কিছুটা লাঘব তাঁকে করতেই হবে।

কিন্তু মেদিনীপুরে চাকরি পাবার সুযোগ কোথায়? কি চাকরি তিনি করবেন, আর কে-ই বা তাঁকে চাকরি দেবে?

অবশেষে কলকাতা যাওয়াই তিনি স্থির করলেন। মাকে বললেন—মা, আমি কলকাতা যাবো।

দুর্গাদেবী বললেন—সে কি, এতদূর অচেনা জায়গায় কি করে যাবি?

ঠাকুরদাস বললেন—যেতে পারবো মা। তুমি কোন চিন্তা করো না। বাচস্পতিরা সেখানে রয়েছেন। আর কলকাতায় গেলে একটা কাজ যোগাড় করে নিতে পারবোই।

দুর্গাদেবী অগত্যা অনুমতি দিলেন। ঠাকুরদাস রওনা হলেন কলকাতা অভিমুখে।

ঠাকুরদাস কলকাতা পেঁৗছেই সভারাম বাচস্পতির সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁরা তাঁদের আত্মীয়। পরিচয় দেওয়ার পর চিনতে পারলেন। ঠাকুরদাসের মুখে সমস্ত দুঃখের কাহিনী শুনে তাঁর মনে দয়া হলো। বললেন—তুমি রামজয়ের ছেলে? যা হোক, আমার এখানে থেকে চাকরির চেষ্টা করো। দেখো, যদি তাতে মায়ের দুঃখ কিছুটা লাঘব হয়।

ঠাকুরদাস সেই বাড়িতে থেকেই চাকরির চেষ্টা করতে লাগলেন। কয়েকদিন চাকরির জন্য ঘুরেই বুঝতে পারলেন লেখাপড়া ভাল না জানলে চাকরি পাওয়া কঠিন। অথচ পিতা নিরুদ্দেশ হওয়ায় লেখাপড়া শেখার বিশেষ সুযোগ পাননি। পড়ার মধ্যে পড়েছেন শুধু সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ।

ইচ্ছা হলো কলকাতায় চতুষ্পাঠিতে পড়বেন। কিন্তু গ্রামে দঃখিনী মা ও ভাইবোনদের কথা মনে হলে তার মন অস্থির হয়ে উঠতো। চাকরি তাঁকে করতেই হবে। অথচ তখনকার দিনে মোটামুটি ইংরেজী না জানলে ব্যবসায়ীদের অফিসে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। তাই সংস্কৃত না শিখে ইংরেজীই শিখবেন স্থির করলেন ঠাকুরদাস।

কিন্তু কোথায় শিখবেন? দু-একটি ইংরেজী ইস্কুল যা আছে, সেখানে তাঁর মত গরিব লোকের পড়া সম্ভব নয়।

যাঁর বাড়িতে তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন সেই সভারাম বাচস্পতির ছেলে ছিলেন জগমোহন ন্যায়ালঙ্কার। তাঁর কাছে ঠাকুরদাস সব কথা খুলে বললেন। ন্যায়ালঙ্কারের পরিচিত একজন ইংরেজী জানা লোক ছিলেন, তিনি ঠাকুরদাসের অবস্থার কথা জেনে তাঁকে ইংরেজী পড়াতে রাজী হলেন।

হাতে যেন চাঁদ পেলেন ঠাকুরদাস। কিন্তু ভদ্রলোক দিনের বেলা চাকরি করতেন, রাতের বেলা ছাড়া অন্য সময় তাঁর পড়াবার সুযোগ ছিল না। তাই ঠাকুরদাস সন্ধ্যার পর তাঁর কাছে পড়তে যেতেন। ফিরতে বেশ একটু রাত হতো। কিন্তু তার আগেই সেই বাড়ির খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে যেতো। ঠাকুরদাসের ভাগ্যে আর আহার জুটতো না। সেজন্য রাত্রে তাঁকে অনাহারে থাকতে হতো।

এর ফলে ঠাকুরদাসের শরীর দিনে দিনে রোগা হয়ে যেতে লাগলো। ইংরেজী শিক্ষকের দৃষ্টিতে তা এড়ালো না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন—তোমার শরীর দিনে দিনে এমন হয়ে যাচ্ছে কেন হে?

ঠাকুরদাস তখন সব কথা ভদ্রলোককে খুলে বললেন। বলতে বলতে তাঁর চোখ জলে ভরে উঠলো। ভদ্রলোক বললেন—তোমাকে অন্যত্র থাকার ব্যবস্থা করে দেবো।

কয়েকদিনের মধ্যেই ভদ্রলোক অন্য এক বাড়িতে ঠাকুরদাসের থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। সেই বাড়িতে তাঁকে নিজের হাতে রান্না করে খেতে হতো। তবু এত কষ্ট করেও ঠাকুরদাসের ইংরেজী শেখার উৎসাহ কমলো না।

কিন্তু কি অদৃষ্ট! সেখানেও বেশীদিন থাকা চললো না। তখন কোনদিন একবেলা খাওয়া জুটতো, কোনদিন জুটতো না। কলকাতায় আসবার সময় ঠাকুরদাস একখানা পেতলের থালা ও একটা ছোট ঘটি সঙ্গে করে এনেছিলেন। থালায় ভাত খেতেন, ঘটিতে খেতেন জল। ভাবলেন থালাখানা বেচে দেবেন। তা হলে সেই পয়সায় অন্ততঃ কয়েকদিন খাওয়া চলবে।

কিন্তু বেচতে পারলেন না। অপরিচিত লোকের কাছ থেকে কোন দোকানদার থালা কিনতে রাজী হলো না।

একদিন খিদের জ্বালায় কাতর হয়ে ঠাকুরদাস এদিক ওদিক ঘুরতে লাগলেন। খিদের কথা ভুলতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাতে ফল হলো বিপরীত। বড়বাজার থেকে ঠনঠনে পর্যন্ত গিয়ে তাঁর আর হাঁটবার ক্ষমতা রইলো না। একটি দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সেটি ছিল এক বিধবা স্ত্রীলোকের মুড়ি মুড়কির দোকান। ঠাকুরদাস তাঁকে বললেন—আমাকে একটু জল খাওয়াতে পারো মা?

বিধবা স্ত্রীলোকটি দেখলেন, ব্রাহ্মণের ছেলে জল চাইছে। শুধু জল দেবেন? তাই তিনি তাড়াতাড়ি এক গ্লাস জল ও এক মুঠো মুড়কি দিলেন।

ঠাকুরদাস যে ভাবে মুড়কি খেলেন তা দেখে স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞেস করলেন—বাবাঠাকুর, তোমার বুঝি আজ কিছু খাওয়া হয়নি?

ঠাকুরদাস বললেন—না মা, আজ এখন পর্যন্ত আমি কিছু খাইনি।

স্ত্রীলোকটি বললেন—দাঁড়াও বাবা, এখন জল খেয়ো না। তুমি ভিতরে এসো বসো।

ঠাকুরদাস ভিতরে গিয়ে বসলেন। স্ত্রীলোকটি কাছাকাছি কোন ময়রার দোকান থেকে দই এনে মুড়ি, মুড়কি ও চিড়া দিয়ে তাঁকে খেতে দিলেন।

ঠাকুরদাসের ক্ষুধা নিবৃত্ত হলো। স্ত্রীলোকটি বললেন—বাবা, যেদিন তোমার এরূপ অবস্থা হবে সেদিন এখানে এসে খেয়ে যেও। কোন লজ্জা করো না।

ঠাকুরদাস জীবনে কোনদিন এই দয়াবতী বিধবা নারীর কথা ভোলেননি।

দিনের পর দিন কেটে যায়। চাকরি হয় না। ঠাকুরদাসের যখনই গ্রামে মায়ের কথা ও ক্ষুধার্ত ভাইবোনদের কথা মনে হয় তখন আর তিনি স্থির থাকতে পারেন না। ঠাকুরদাস পাগল হয়ে চাকরির জন্য ঘোরাঘুরি করেন।

কিছুদিন পর একটি চাকরি পেলেন ঠাকুরদাস। মাইনে দু টাকা। তাতেই তাঁর মনে কি আনন্দ। মা ও ভাইবোনদের মুখে এবার কিছু তুলে দিতে পারবেন।

ছেলের চাকরির খবর পেয়ে মা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। একটা বোঝা যেন নেমে গেল তাঁর বুক থেকে। দাদার চাকরি হয়েছে জেনে ভাইবোনেরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল।

দু বছর পরে ঠাকুরদাসের মাইনে বেড়ে হলো পাঁচ টাকা। ভাই কালিদাসও কিছু কিছু রোজগার করতে লাগলো। মা ও ভাইবোনদের দঃখের অনেক লাঘব হলো।

সৌভাগ্য যখন আসে তখন নানাদিক দিয়েই শুভ লক্ষণ ফুটে ওঠে।

এমন সময় হঠাৎ একদিন এসে উপস্থিত হলেন রামজয়। তাঁর কথা সংসারের সবাই প্রায় ভুলে গিয়েছিল।

প্রথমে রামজয় গিয়েছিলেন বনমালীপুরে। সেখানে স্ত্রীপুত্রদের কাউকে দেখতে না পেয়ে বীরসিংহ গ্রামে এলেন। প্রায় আট বছর পরে আবার সকলের মিলন হলো।

রামজয় বললেন দুর্গাদেবীকে—কেন ফিরে এলাম জানো?

দুর্গাদেবী জিজ্ঞেস করলেন—জানি না তো। কেন?

—তীর্থের পথে এতকাল ঘুরছিলাম। কেদার পাহাড়ে একদিন ঘুমিয়ে আছি, দেখলাম এক অদ্ভুত স্বপ্ন।

—কি স্বপ্ন?

—আমাদের ঘরে এক প্রতিভাবান পুরুষ জন্মাবে, সে আমাদের বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে।

সে কথা শুনে আনন্দে ও গর্বে ভরে উঠলো দুর্গাদেবীর বুক।

রামজয় বললেন—ঠাকুরদাসের বিয়ে দেবো। তোমার দু ছেলে এখন রোজগার করছে, চিন্তা কি। তবে এখানে শ্বশুরবাড়ির কাছে থাকা আমাদের উচিত হবে না। লোকে নিন্দা করবে। চলো বনমালীপুরে ফিরে যাই।

দুর্গাদেবী বললেন—কিন্তু সেখানে তোমার ভাইরা যে ব্যবহার করেছে, তারপরেও আবার সেখানে যেতে বলো?

সে কথা ভেবে রামজয় নিরস্ত হলেন। এরপর থেকে বীরসিংহ গ্রামেই তাঁদের স্থায়ী নিবাস গড়ে উঠলো।

রামজয় ঠাকুরদাসের বিয়ের জন্য খোঁজখবর করতে লাগলেন। অবশেষে খবর পেলেন গোঘাটের রামকান্ত তর্কবাগীশের মেয়ে ভগবতী পাত্রী হিসেবে

ভালো। পাতুলগ্রামে মামাবাড়িতে সে মানুষ হয়েছে, সেখানেই থাকে। দেখে রামজয়ের পছন্দ হলো। রূপে গুণে মেয়েটি সত্যি ভগবতী।

যথাসময়ে ঠাকুরদাসের সঙ্গে ভগবতীদেবীর বিয়ে হয়ে গেল।

রামজয়ের কর্তব্য শেষ।

আবার তিনি একদিন বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন।

ফিরলেন অনেকদিন পরে, তখন ভগবতী সন্তান-সম্ভবা।

কিন্তু একি! পেটে সন্তান আসা অবধি ছেলের বউ পাগল। বদ্ধ পাগলের মত তার চলাফেরা, কথাবার্তা। কত চিকিৎসা করা হলো, কিছুতেই কিছু হলো না।

কেউ বললেন—উৎকট রোগে ধরেছে, সহজে সারবে না। কেউ বললেন—ডাইনি পেয়েছে।

এলেন দৈবজ্ঞ জ্যোতিষী ভবানন্দ শিরোমণি। গণনা করে বললেন—সুপুত্র জন্মের লক্ষণ দেখছি, ভয়ের কোন কারণ নেই। আসলে এর কোন রোগ হয়নি। ঈশ্বর অনুগৃহীত কোন মহাপুরুষ এর গর্ভে এসেছেন, তাঁর তেজ-প্রভাবে এরূপ হচ্ছে।

শিরোমণি বলে গেলেন—রোগিণীকে কোন ওষুধ খাওয়ানো দরকার নেই। আপনিই সব সেরে যাবে।

সেদিন থেকে ওষুধ খাওয়ানো বন্ধ হলো। বন্ধ হলো সব রকম চিকিৎসা। সবাই এক অনাগত দিনের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

জ্যোতিষীর বাণী সত্যি হলো। যথাসময়ে জন্মগ্রহণ করলেন এক মহাপুরুষ। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পরই ভগবতী দেবীর উন্মাদ রোগও সেরে গেল।

বারোশো ছাবিবশ সালের ১২ই আশ্বিন, মঙ্গলবার। ইংরেজী আঠারো শো কুড়ি সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর।

ঠাকুরদাস সেদিন বাড়ি ছিলেন না। কোমরগঞ্জের হাটে গিয়েছিলেন। ফিরবার পথে দেখা হলো পিতার সঙ্গে। রামজয় বললেন—ঠাকুরদাস আজ আমাদের একটা এঁড়ে বাছুর হয়েছে।

ঠাকুরদাস রহস্য বুঝতে পারলেন না। বাড়িতে তাঁদের গরু ছিল। ভাবলেন সেই গরুর বাচ্চা হয়েছে। তাই গোয়ালঘরে চলে গেলেন। গিয়ে দেখেন, তা নয়। রামজয় তখন ঠাকুরদাসকে সূতিকাঘরের কাছে নিয়ে এলেন। বললেন—এই যে এখানেই সেই এঁড়ে বাছুর।

ঠাকুরদাস লজ্জিত হলেন একটু। রামজয় বললেন—আমি বলছি ঠাকুরদাস, এই ছেলে এঁড়ের মতই একগুঁয়ে হবে।

এক শুভক্ষণে সেদিন জন্ম নিল এক দেবশিশু। ঈশ্বরচন্দ্র।

আঁতুড় ঘরে রামজয় নবজাতকের জিহ্বার নীচে কয়েকটি কথা লিখে দিলেন। কি লিখলেন কারুর কাছে বললেন না।

আঁতুড় ঘর থেকে বেরিয়ে দুর্গাদেবীকে বললেন—তোমার নাতি কিছুক্ষণের জন্য মায়ের দুধ পান করতে পারবে না। সেজন্য ভয় করো না কিছু। কোমল জিহ্বায় আমার কঠিন হাত দেওয়ায় কিছুদিন তোমার নাতি তোতলা হয়ে থাকবে। কিন্তু পরম দয়ালু ও অদ্বিতীয় পুরুষ হবে।

দুর্গাদেবী তবু আঁতকে উঠলেন। কিন্তু পণ্ডিত ও সর্বজ্ঞ রামজয়ের ওপর কোন কথা বলতে পারলেন না।

কত আকাঙ্ক্ষার—কত প্রতীক্ষার পর শিশুর জন্ম হয়েছে—সেই আনন্দেই সকলে অধীর।

দুই

পাঠশালার ছুটি হয়েছে।

মাঠের পথ দিয়ে চলেছে ঈশ্বর। সঙ্গে কয়েকজন সহপাঠী।

পাশেই ধানক্ষেত। ধানের শীষ হাওয়ায় দুলছে। ঈশ্বর বললো—বাঃ, দ্যাখ্ কি সুন্দর!

সেই ধানের শিষের দিকে তাকিয়ে ঈশ্বরের মনে কি আনন্দ। হাত দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে ধানের গাছ। শিষগুলি হাতে লাগছে আর শিউরে উঠছে গা। বাঃ, বেশ তো!

ঈশ্বর হাত দিয়ে ছিঁড়ে ফেললো কয়েকটা শিষ। একমুঠো কচি ধান মুখে ফেলে চিবুতে লাগলো।

কিন্তু তাতে এমন বিপত্তি ঘটবে কে জানে! ধারালো শিষ গলায় আটকে গেল।

তার গলার অদ্ভুত কাশির শব্দ শুনে চমকে উঠলো সহপাঠীরা। ওরে দ্যাখ্, ঈশ্বরের কি হয়েছে!

সবাই বুঝতে পারলো গলায় ওর ধানের শিষ আটকে গেছে। তার ফলে ওর দম বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে।

কি করবে কিছু ঠিক করতে পারলো না সহপাঠীরা। তারা দিশেহারা হয়ে পড়লো। তখন সবাই ধরাধরি করে ঈশ্বরকে নিয়ে এলো বাড়িতে।

বাড়িতে সাড়া পড়ে গেল—দেখো দেখো, ঈশ্বরের কি হয়েছে।

সবার আগে ছুটে এলেন ঠাকুরমা দুর্গাদেবী। চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন —কি হয়েছে? কি হয়েছে ঈশ্বরের?

ছেলেরা বললো—ধানের শিষ খেয়েছে।

দুর্গাদেবী তাড়াতাড়ি ঈশ্বরের গলায় আঙুল দিয়ে ধানের শিষগুলো বের করে ফেললেন।

ঈশ্বর বেঁচে গেল। আর কিছুক্ষণ দেরি হলে কি যে হতো কে জানে?

ঈশ্বরচন্দ্রের পাঁচ বছর বয়সেই শুরু হয় পাঠশালা জীবন।

ঠাকুরদাস নিজে বেশী লেখাপড়া শিখতে পারেননি। সেজন্য তাঁর মনে খুব আপসোস ছিল।

ভেবেছিলেন ছেলেকে ভালভাবে লেখাপড়া শিখিয়ে নিজের অতৃপ্ত বাসনা পূরণ করবেন। তাই তাড়াতাড়ি পাঠশালায় ভরতি করিয়ে দিয়েছিলেন।

কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ছিলেন তখনকার দিনের আদর্শ গুরুমশাই। তাঁর পাঠশালাটিও ছিল খুব বিখ্যাত। ঈশ্বরচন্দ্রকে সেই পাঠশালাতেই ভর্তি করিয়ে দেওয়া হলো।

পাঠশালার মধ্যে সবচেয়ে ভাল ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র। গুরুমশায় তাকে খুব ভালবাসেন। সেজন্য তাঁর গর্বও কম নয়। অন্যান্য ছাত্রদের বলেন—দ্যাখ্, ঈশ্বর পড়াশোনায় কি ভালো। আর তোরা যে কি! তোদের দ্বারা কিচ্ছু হবে না।

কালীকান্ত বুঝতে পেরেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বড় হলে একজন জ্ঞানী মানী লোক হবে। তাই তার দিকে খুব নজর রাখতেন।

ঈশ্বরচন্দ্র ধানের শিষ খেয়ে প্রায় মরতে বসেছিল শুনে কালীকান্তের কি দুশ্চিন্তা! সেই থেকে তাকে অন্যসব ছেলেদের সঙ্গে বাড়ি যেতে দেন না। নিজে সঙ্গে যান। কোন কোন দিন কোলে করেও দিয়ে আসেন।

ছোটবেলা থেকে হাতের লেখাও খুব ভাল ছিল ঈশ্বরচন্দ্রের। সেজন্য গুরুমশায়ও তার ওপর খুব সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি ঈশ্বরের হাতের লেখা অন্যান্য ছেলেদের দেখিয়ে বলতেন—দ্যাখ্ তো, কেমন সুন্দর হাতের লেখা। তোরা যে কি লিখিস্!

অন্যান্য ছাত্ররা লজ্জায় মাথা নোয়াতো।

হঠাৎ কঠিন অসুখ হলো ঈশ্বরের। প্লীহাজ্বর ও উদরাময়। কিছুতেই রোগ সারে না। একেই ঈশ্বরের স্বাস্থ্য খুব ভালো ছিল না, তার ওপর ভুগে ভুগে আরো খারাপ হয়ে পড়লো।

ভগবতী দেবীর বড় মামা রাধামোহন বিদ্যাভূষণ থাকতেন পাতুলে। তিনি সেই খবর পেলেন। একদিন তিনি নিজেই গিয়ে হাজির হলেন বীরসিংহ গ্রামে। বললেন—এখানে ঈশ্বরের রোগ সারবে না। আমার সঙ্গে চল্।

ভগবতী দেবী ঈশ্বরচন্দ্রকে নিয়ে পাতুলে চলে এলেন। সেখানকার রামগোপাল কবিরাজ ছিলেন খুব ভাল চিকিৎসক। তাঁর চিকিৎসায় কিছুদিনের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রের রোগ সেরে গেল। আবার ভগবতী দেবী ছেলেকে নিয়ে ফিরে এলেন বীরসিংহ গ্রামে।

এমনি ভাবে ছয়মাস পাঠশালায় কামাই হয়ে গেল। আবার নতুন করে শুরু হলো পাঠশালার পড়া।

ঈশ্বরচন্দ্রের আগের স্বাস্থ্য অবশ্য ফিরে এলো। কিন্তু এমনিতেই তার দেহের গঠন খুব ভালো ছিল না। মাথাটি ছিল বড়, সেই অনুপাতে শরীর ছিল ক্ষীণ।

তবু এই ছিল ঠাকুরদা ও ঠাকুরমার নয়নের মণি। বৃহৎ মাথাটি দুলিয়ে সেই ছোটখাটো চেহারার বালকটি যখন ছুটে এসে তাঁদের কোলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো তখন তাঁরা যেন হাতে চাঁদ পেতেন।

কিন্তু তাঁরা হয়তো জানতেন না, দুরন্তপনা করে ঈশ্বর বাড়ির ভেতর থেকে পালিয়ে এসেছে। কিছুক্ষণ পরই সেখানে এসে উপস্থিত হতেন ভগবতী দেবী। তাঁর মারমুখী মূর্তি।

দুর্গাদেবী বলতেন—কি হয়েছে বউমা?

ভগবতী দেবী বলতেন—বড্ড দুষ্টু হয়েছে মা। কি জ্বালাতন যে করে।

দুর্গাদেবী বলতেন—এ বয়সে অমন হয়েই থাকে।

নাতিকে তিনি বুকে জড়িয়ে ধরতেন। বালকও তাঁদের আশ্রয়ে নিজেকে পরম নিরাপদ মনে করতো।

ছেলের নানা ধরনের দুরন্তপনায় ভগবতী দেবীকে মাঝে মাঝে উত্যক্ত-হতে হতো। তিনি বিরক্ত হয়ে বলতেন—এত দুষ্টু হলে কি চলে?

রামজয় বলতেন—সব মহাপুরুষরাই ছেলেবেলায় খুব দুষ্টু ছিলেন, তা কি জানো না? নিমাই পণ্ডিতের দৌরাত্ম্যে নদীয়ার লোক একদা অস্থির হয়ে উঠতো।

ভগবতী দেবী একটু যেন কৌতুক ও বিদ্রূপ জড়িত কণ্ঠেই বলে উঠতেন —তাই বলে নিমাই পণ্ডিতের সঙ্গে তুলনা?

রামজয় বলতেন—আমি বলে রাখলাম বউমা, তোমার এই ছেলে যদি একজন কীর্তিমান পুরুষ না হয় তবে আমি পৈতে ফেলে দেবো।

ভগবতী দেবী শ্বশুরের কথার ওপর আর কথা বলতেন না। জ্যোতিষীরাও তো তাঁর ছেলের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।

আট বছর বয়স পর্যন্ত বালক ঈশ্বরচন্দ্রের পাঠশালায় পড়া চললো।

পণ্ডিত কালীকান্ত দেখলেন—ঈশ্বর পাঠশালার পড়া সবকিছুই শেষ করে ফেলেছে। তাঁর আর পড়বার কিছু নেই।

ঠাকুরদাস কলকাতাতেই থাকতেন। বাড়িতে আসতেন খুবই কম। কাজেই ছেলের কথা সবকিছু জানতেন না। বাবার অসুখের কথা শুনে সেবার বাড়ি এলেন।

পথে একদিন দেখা হলো পণ্ডিত কালীকান্তের সঙ্গে। কালীকান্ত বললেন —ঠাকুরদাস, এখানকার পাঠশালায় যা শেখবার ঈশ্বরচন্দ্র তা সবই শিখে ফেলেছে। ওর হাতের লেখা খুব ভালো। স্মৃতিশক্তি প্রখর। ওকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ইংরেজী পড়ালে জীবনে উন্নতি করতে পারবে।

কথাটা ঠাকুরদাসের মনে খুব ধরলো। তিনি বাড়ি ফিরেই বাবাকে সে কথাটা জানালেন।

রামজয় বললেন—কালীকান্ত কথাটা মন্দ বলেনি। ওকে কলকাতাতেই নিয়ে যা।

ঠিক হলো, ঠাকুরদাস ঈশ্বরচন্দ্রকে কলকাতায় নিজের কাছেই রাখবেন।

যাওয়ার তারিখও ঠিক হয়ে গেল। এমন সময় রামজয়ের রোগ খুব বাড়াবাড়ি দেখা দিল। কাজেই যাওয়া আর হলো না।

পিতাকে কিছুটা সুস্থ দেখে ঠাকুরদাস কলকাতায় চলে গেলেন। কিন্তু তার কিছুকাল পরেই রামজয় মারা গেলেন। গভীর শোকের ছায়া নেমে এলো বীরসিংহের বাঁড়ুয্যে পরিবারে।

পিতার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ঠাকুরদাস কলকাতা থেকে চলে এলেন। নিজের সাধ্যমত পিতৃশ্রাদ্ধের কাজ সম্পন্ন করলেন।

দাদুর মৃত্যুতে কিন্তু মনে খুবই দুঃখ পেল ঈশ্বরচন্দ্র। বাড়িটা যেন ফাঁকা ফাঁকা মনে হতে লাগলো। যাঁর কোলে পিঠে এতদিন মানুষ হয়েছে, সেই দাদু নেই। সবচেয়ে প্রিয় বস্তুটি সে যেন হারিয়ে ফেলেছে।

ঠাকুরদাসের কলকাতা যাওয়ার দিন ঘনিয়ে এলো। তিনি একদিন জিজ্ঞেস করলেন ঈশ্বরচন্দ্রকে—ঈশ্বর, আমার সঙ্গে কলকাতা যাবি?

ঈশ্বর যেন হাতে চাঁদ পেল। আনন্দে অধীর হয়ে বললো—হ্যাঁ বাবা, যাবো।

তখন কলকাতায় যাওয়ার রেলগাড়ি হয়নি। যেতে হতো হেঁটে ও জলপথে। কিন্তু জলপথে যাওয়া খুব নিরাপদ ছিল না। নদীতে ছিল ঝড়তুফানের ভয় আর তা ছাড়া ছিল জলদস্যুদের উপদ্রব। কাজেই অনেকেই নৌকায় আসতে ভরসা পেত না। কষ্টকর হলেও হাঁটাপথেই তখন লোকে মেদিনীপুর থেকে কলকাতায় আসতো।

ঠাকুরদাসও স্থির করলেন হেঁটেই কলকাতা যাবেন। কিন্তু চিন্তা হলো ঈশ্বরকে নিয়ে। এতটুকু ছেলে কি করে এতটা পথ হাঁটবে?

ঠাকুরদাস জিজ্ঞেস করলেন—আমরা তো হেঁটে যাবো, তুই এতটা পথ হাঁটতে পারবি?

কলকাতা যাওয়ার উৎসাহে ঈশ্বরচন্দ্র বললো—হ্যাঁ, পারবো বাবা।

কলকাতা শহরে যাবে, সেজন্য বালকের মনে কত উৎসাহ! কিন্তু উৎসাহ নেই মা ও ঠাকুরমার মনে। বাড়ির একমাত্র আদরের দুলালকে চোখের আড়াল করতে তাঁদের মন চায় না।

শুভদিন দেখে ঠাকুরদাস কলকাতা যাত্রা করলেন। ঈশ্বর প্রণাম করলো মা ও ঠাকুরমাকে। তাঁদের দুজনের চোখেই জল। ছেলে এতদূর চলে যাচ্ছে ভেবে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন ভগবতী দেবী।

দুরন্ত বালক ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতা পড়তে যাচ্ছে—তাই গাঁয়ের অনেকেই দেখতে এলো। পণ্ডিত কালীকান্ত এলেন। তিনি শুধু দেখতেই এলেন না, তাঁর প্রিয় ছাত্রের সঙ্গীও হলেন। কলকাতা যাত্রার পথে আরও একজন সঙ্গী হলো—ভৃত্য আনন্দরাম।

যাত্রা শুরু হলো। দীর্ঘ পথ। বীরসিংহ থেকে কলকাতা প্রায় ছাব্বিশ

ক্রোশ দূরে। তিন দিন দু রাত লাগলো কলকাতা পেঁছতে। এতটা পথ অবশ্য ঈশ্বরচন্দ্রকে হাঁটতে হয়নি। সে কখনো উঠেছে আনন্দরামের কোলে, কখনও চড়েছে ঠাকুরদাসের কাঁধে আর কখনো হেঁটে চলেছে।

প্রথম রাত তাঁরা কাটালেন পাতুল গ্রামে। সেখানে ঠাকুরদাসের মামাশ্বশুরের বাড়ি। সেই বাড়িতেই সেদিন তাঁরা রইলেন। দ্বিতীয় রাত কাটালেন সন্ধিপুর গ্রামে। সেখানেও তাঁদের এক আত্মীয়-বাড়ি ছিল।

এই ভাবে তাঁদের চলতে লাগলো পথের পর পথ অতিক্রম। তৃতীয় দিনে শেয়াখালা থেকে যে বাঁধা সড়ক শুরু হয়েছে, সেই পথ দিয়ে হাঁটতে লাগলেন। পথের ধারে থাকে মাইল-স্টোন—পাথরের ওপর ক্ষোদিত থাকে পথের দূরত্ব-চিহ্ন। তা দেখেও বালক ঈশ্বরচন্দ্রের কৌতূহলের সীমা নেই। সে তার বাবাকে জিজ্ঞেস করলো—বাবা, বাটনা-বাটা শিলের মত ওটা কি?

ঠাকুরদাস জবাব দিলেন—ওটা মাইল-স্টোন। প্রতি মাইল অন্তর অন্তর পোঁতা থাকে। তাতে ইংরেজীতে অক্ষর লেখা থাকে।

—ওটা কি অক্ষর বাবা?

—ওটা এক।

—আর ওটা?

—ওটা দুই।

এইভাবে এক এক মাইল পথ তাঁরা পার হন আর মাইল-স্টোনের গায়ে এক একটি ইংরেজী অঙ্কের অক্ষর দেখতে পায় ঈশ্বরচন্দ্র। এইভাবে এক থেকে দশ পর্যন্ত অক্ষরের সঙ্গে তার পরিচয় হয়ে গেল।

এ ভাবে শালিমারের বাঁধা সড়ক দিয়ে হেঁটে তাঁরা এলেন কলকাতার ওপারে গঙ্গার তীরে।

তখন সন্ধ্যা হয় হয়। খেয়ানৌকা পার হয়ে তাঁরা এসে পেঁছলেন কলকাতার ঘাটে।

কলকাতা শহর তখন গ্রাম্য বেশ ছেড়ে ধীরে ধীরে আধুনিক রূপে সজ্জিত হচ্ছে। সেই নূতন ঝলমল রূপ দেখে চোখ ঝলসে গেল বালক ঈশ্বরচন্দ্রের।

গ্রাম থেকে শহর।

বালক ঈশ্বরের চোখে যেন এক নূতন আবিষ্কার!

বড়বাজার দয়েহাটা। গঙ্গার ঘাট থেকে খুব বেশী দূরে নয়। সেখানেই সকলের গন্তব্যস্থল।

বড়বাজারে দয়েহাটায় ভাগবতচরণ সিংহের বাড়িতেই ঠাকুরদাস এক সময় আশ্রয় পেয়েছিলেন। ভাগবতচরণ এখন বেঁচে নেই। তাঁর ছেলে জগৎদুর্লভ এখন বাড়ির কর্তা।

সেই বাড়িতেই ঠাকুরদাস উঠলেন। ভাগবতচরণ বেঁচে না থাকলেও তাঁর

বিধবা মেয়ে রাইমণি আছেন—যাঁর আদর-যত্নের কথা ঠাকুরদাস কখনো ভুলতে পারবেন না।

মস্তবড় তিনতলা বাড়ি। তারই একতলা ঘরে তাঁদের থাকার জায়গা। আগেও ঠাকুরদাস এই ঘরেই ছিলেন। আগে থাকতেন একলা এখন সঙ্গী হলো পুত্র।

ভৃত্য আনন্দরাম এবং পণ্ডিতমশাই কয়েকদিন থেকেই চলে গেলেন। এরপর ঈশ্বরচন্দ্রের ভারী বিশ্রী লাগতে লাগলো। গ্রামের বাড়িতে মা ঠাকুরমা ছিলেন এবং খেলার সাথী ছিল গ্রামের অনেক ছেলে। কিন্তু এখানে সে একা। বাবা তো বেশীক্ষণ থাকেন না, তিনি কাজে চলে যান।

কাজেই ঈশ্বরচন্দ্রের খুব নিঃসঙ্গ বোধ হতে লাগলো।

প্রথমে এসেই হর্ম্যরাজি শোভিত কলকাতা নগরী দেখে তার মনে যে আনন্দ হয়েছিল সে আনন্দ আর রইলো না। এখানে গ্রামের মত প্রচুর গাছপালা নেই, অত খোলা মাঠ নেই, নেই চোখ জুড়ানো সবুজ ধানক্ষেত—সময় সময় মনে হয় যেন পাষাণপুরী।

তবে কয়েকদিনের মধ্যেই একজন খেলার সাথী পাওয়া গেল। রাইমণির একমাত্র ছেলে গোপাল। গোপাল ঈশ্বরচন্দ্রেরই সমবয়সী। গোটা বাড়ির মধ্যে ঐ একটিমাত্রই ছেলে।

রাইমণি অনেকটা নিজের ছেলের মতই ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখতেন। তাঁর স্নেহ ও করুণার দৃষ্টি ঈশ্বরচন্দ্রের ওপর পড়েছিল বলেই তার জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠেনি।

ঠাকুরদাস সব সময়েই নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। মাইনে বেড়ে তাঁর দশ টাকা হয়েছে কিন্তু খাটুনির অন্ত নেই। দোকানের বিল আদায়ের কাজ করতেন। সকালে বেরিয়ে যেতেন, ফিরতেন দুপুরে। ফিরে রান্না করে ছেলেকে খাওয়াতেন, আর নিজে কোনরকমে চারটি মুখে গুঁজে বেরিয়ে যেতেন। ফিরতে অনেক রাত হতো।

দুপুরবেলা রান্না চাপিয়ে ঠাকুরদাস একদিন নিজের হিসাব মিলাতে বসলেন। জগৎদুর্লভবাবুর কতগুলি ইংরেজী বিল ছিল, সেগুলি ঠিক করতে লাগলেন। পাশে বসে ঈশ্বরচন্দ্র বললো—বাবা, আমি ওগুলো ঠিক করে দিতে পারি।

ঠাকুরদাস জিজ্ঞেস করলেন—কি করে করবি? এগুলি যে ইংরেজী নম্বর দেওয়া বিল।

ঈশ্বরচন্দ্র বললো—আমি তো ইংরেজী অঙ্কের অক্ষর আসবার সময় পথে শিখে এসেছি।

—এখনো মনে আছে সব?

—হ্যাঁ, আছে।

ঠাকুরদাস ছেলেকে কয়েকটি বিল ঠিক করতে দিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র নির্ভুল-ভাবে অঙ্কর মিলিয়ে ঠিক করে ফেললো। ঠাকুরদাস অবাক্ হয়ে গেলেন।

পণ্ডিত কালীকান্ত তখনও কলকাতা ছেড়ে যাননি। সেই সময় তিনি কাছেই ছিলেন। এই ব্যাপার দেখে কালীকান্ত ঈশ্বরচন্দ্রকে কোলে তুলে নিয়ে চুমো খেলেন। বললেন—চিরজীবী হও ঈশ্বর। আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে।

এইভাবে কিছুদিন কেটে গেল।

এখন ভাবনা হলো ঠাকুরদাসের, যে জন্য ছেলেকে নিয়ে এসেছেন তার ব্যবস্থা তাড়তাড়ি করতে হবে। কিন্তু কোথায় পড়াবেন? সিংহী-বাড়ির একটু দূরেই মল্লিক বাড়িতে আছে একটা পাঠশালা। সেখানে পড়ালে কেমন হয়?

জগৎদুর্লভ বললেন—ঈশ্বরকে ঐ মল্লিক বাড়ির পাঠশালায় ভরতি করে দিন না। স্বরূপচন্দ্র দাস ঐ পাঠশালার পণ্ডিত, ভালই পড়ান। আমার ভাগনেরা ওখানে পড়ে, মল্লিক বাড়ির ছেলেরাও পড়ে। এ বছরটা ঈশ্বর ওখানেই পড়ুক না।

ঠাকুরদাস ভেবে দেখলেন, পাঠশালাটা কাছে আছে, ওখানে ভরতি করে দেওয়াই ভালো। তাই স্বরূপ দাসের পাঠশালাতেই ছেলেকে ভরতি করিয়ে দিলেন।

সে বছর বার্ষিক পরীক্ষায় আর তিনমাস মাত্র বাকী ছিল। সেই তিন-মাসের মধ্যেই ঈশ্বরচন্দ্র পাঠশালার সব পড়া শেষ করে ফেললো। অবাক্ হয়ে গেলেন পণ্ডিতমশাই। এত ছাত্র তিনি পড়িয়েছেন, এমন ছাত্র তো কখনো তাঁর চোখে পড়েনি। বড় হলে এ ছেলে নিশ্চয়ই মস্ত বিদ্বান্ হবে।

বীরসিংহের কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের চেয়েও কলকাতার এই শিক্ষক স্বরূপচন্দ্র দাস ছিলেন শিক্ষাদানে অভিজ্ঞ। তিনিও ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতিভা দেখে মুগ্ধ হলেন—তার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্‌বাণী করলেন।

পাঠশালার পড়া তো শেষ হলো, এখন ছেলেকে কোথায় পড়াবেন? অভাবের তাড়নায় নিজে বেশী পড়াশোনা করতে পারেননি, কিন্তু ছেলেকে তো বিদ্বান্ করে তুলতে হবে।

কিন্তু ঠাকুরদাসের উচ্চ আশায় হঠাৎ বাধা পড়লো। কলকাতার জলবায়ু ঈশ্বরচন্দ্রের সহ্য হলো না।

তখন কলকাতায় রাত্রিতে মশা আর দিনে মাছির খুব উৎপাত ছিল। জলের কল, মাটির তলায় ড্রেন এসব তখন হয়নি। গ্রামাঞ্চল থেকে এসে অনেকেই তখন পেটের অসুখে ভুগতো। ঈশ্বরচন্দ্রেরও তাই হলো।

পেটের অসুখ থেকে হলো রক্তাতিসার। ঠাকুরদাস চিন্তিত হয়ে পড়লেন। চিকিৎসার ও সেবাযত্নের কোন ত্রুটি করলেন না। পুত্রের মলমূত্র নিজের হাতে পরিষ্কার করতে লাগলেন।

বাড়িতে খবর গেল। নাতির অসুখের কথা শুনে পাগলের মত হয়ে ছুটে এলেন দুর্গাদেবী। দিনরাত নাতির সেবা-শুশ্রূষায় ও ওষুধপত্রের ব্যবস্থায় ব্যস্ত হয়ে রইলেন। কবিরাজী চিকিৎসায় যখন কোন ফল হলো না, তখন দুর্গাদেবী বললেন—ঠাকুরদাস, ঈশ্বরকে আমি বাড়ি নিয়ে যাই।

ঠাকুরদাসও বুঝতে পারলেন, স্থান পরিবর্তন করা দরকার। শহর না ছাড়লে ঈশ্বরের রোগও হয় তো ছাড়বে না। তাই সম্মতি দিলেন।

দুর্গাদেবী ঈশ্বরকে নিয়ে বীরসিংহ গ্রামে ফিরে এলেন।

নিজের বাড়িতে পেঁছে বালকের মনে কি আনন্দ।

ওষুধপত্রের বিশেষ কোন দরকার হলো না। স্থান পরিবর্তনে এবং গাঁয়ের জল হাওয়ায় ঈশ্বরচন্দ্রের শরীর আপনিই সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলো।

ওদিকে বছর ঘুরে এলো।

জ্যৈষ্ঠ মাসে ঠাকুরদাস ঈশ্বরচন্দ্রকে কলকাতায় নিয়ে যাবার জন্যে এলেন।

দুর্গাদেবী বললেন—না, ঈশ্বর এখানেই থাক্। কলকাতায় গিয়ে আবার যদি অসুখ হয়।

ঠাকুরদাস বললেন—কলকাতায় কি আর মানুষ বাস করছে না? তা ছাড়া এখানে থাকলে ওর পড়াশোনা হবে কি করে? আমি মূর্খ হয়েছি বলে ছেলেকেও মূর্খ করে রাখবো? তা ছাড়া এখন না গেলে আর স্কুলেও ভরতি করানো যাবে না।

ঠাকুরদাসের জেদের কাছে সকলকেই মাথা নোয়াতে হলো। ঈশ্বরচন্দ্র আবার বাবার সঙ্গে চললো কলকাতা।

ঠাকুরদাস ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন—কিরে, আনন্দরামকে সঙ্গে নিতে হবে তো? নইলে তোকে কোলে করে নেবে কে?

এতে এতটুকু বালকের মনেও আত্মসম্মানে আঘাত লাগলো। সে বলে উঠলো—না, আমি হেঁটে যেতে পারবো।

আনন্দরাম এবার আর সঙ্গে গেল না। ঠাকুরদাস ঈশ্বরচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করলেন।

সত্যি, ভয়ানক অভিমান ঈশ্বরচন্দ্রের। সে বীরসিংহ থেকে মায়ের মামাবাড়ি পাতুল পর্যন্ত দু ক্রোশ রাস্তা হেঁটে চললো। ঠাকুরদাস কাঁধে নিতে চাইলেও সে কাঁধে উঠতে রাজী হলো না।

সেদিনের মত পাতুলে বিশ্রাম করে পরের দিন তাঁরা আবার পথ চলতে শুরু করলেন। তিন ক্রোশ পথ ঈশ্বরচন্দ্র হেঁটে এল। কিন্তু আর তার পক্ষে হাঁটা সম্ভব হলো না। পা ফুলে উঠলো। ব্যথায় পা টনটন করতে লাগলো।

তখন গ্রীষ্মকাল, রৌদ্রের প্রচণ্ড তেজ। এত পথ হেঁটে আসার পর বালকের

পক্ষে এই সময়ে আর পথ চলা যে কত কঠিন, ঠাকুরদাস তা বুঝতে পারলেন। তবু, না চলে উপায় কি?

ঈশ্বরচন্দ্র বললো—আর যে চলতে পারি না বাবা।

ঠাকুরদাস প্রমাদ গনলেন। তবু খাবার লোভ দেখালে সে হাঁটবে এই ভেবে বললেন—আর একটু হেঁটে চল্ বাবা। ঐ সামনে মাঠে ভাল তরমুজ পাওয়া যায়, কিনে খাওয়াবো।

তরমুজের লোভে ঈশ্বরচন্দ্র আবার হাঁটতে লাগলো। কিন্তু কোথায় তরমুজ? মাঠের পর মাঠ সে পার হয় আর জিজ্ঞেস করে—তরমুজ কোথায় বাবা?

—ঐ তো ঐ সামনের মাঠে। আর একটু হেঁটে চল্।

আরও বেশ কিছুটা পথ পার হয়ে ঠাকুরদাস তরমুজ কিনে ছেলেকে খাওয়ালেন। খেয়ে ঈশ্বরের পেট ঠাণ্ডা হলো বটে, কিন্তু পায়ের ব্যথা কমলো না। এতক্ষণ যা-ও একটু হেঁটে চলছিল, কিছুক্ষণ বসে থাকার পর আর দাঁড়াবার ক্ষমতাও রইলো না। একটুখানি হেঁটেই আবার বসে পড়লো।

—আর যে হাঁটতে পারি না বাবা।

ঠাকুরদাস রেগে উঠলেন। বললেন চলতে না পারিস এই মাঠের মধ্যে বসে থাক্।

এই বলে ঠাকুরদাস ছেলেকে রেখেই নিজে এগিয়ে চললেন। তা দেখে ঈশ্বরচন্দ্র কাঁদতে লাগলো।

ঠাকুরদাস আবার ফিরে এলেন। বিরক্ত হয়ে বললেন—তুই তো লোক আনতে দিলি না।

রাগে ও অভিমানে দু একটি চড়ও মারলেন ছেলের গালে। তাতে ঈশ্বরচন্দ্রের কান্না আরও বেড়ে গেল। তখন ঠাকুরদাস আর কি করেন। ছেলেকে কাঁধে তুলে নিয়ে হেঁটে চললেন।

এ ভাবে কিছুক্ষণ চলার পর ঠাকুরদাস নিজেই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তখন কাঁধ থেকে ছেলেকে নামিয়ে এক জায়গায় বিশ্রাম করতে বসলেন। সেদিন পথ চলায় খুবই দেরি হতে লাগলো।

তিন দিনের দিন ঠাকুরদাস ঈশ্বরচন্দ্রকে নিয়ে কলকাতায় পেঁছিলেন। আবার এলেন সেই পুরানো আশ্রয়স্থলে, দয়েহাটার সিংহী-বাড়িতে!

তিন

ঘরের প্রদীপে তেল নেই।

যেটুকু আছে তাতে আজ রাতটা হয়তো চলবে না। তখন কি হবে?

বালক বইটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। রাস্তায় জ্বলছে কেরোসিনের বাতি। পৌরসভার লোক যারা বাতিগুলি এসে জ্বালিয়ে দেয় তারা কিছুক্ষণ আগে জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। ভোরবেলা এসে আবার নিবিয়ে দেবে।

বালক সেই বাতির থামের তলায় বসে পড়লো। বইটি খুলে পড়তে লাগলো এক মনে।

বইয়ের ভিতর তন্ময় হয়ে কতক্ষণ ছিল তা খেয়াল নেই। মুহূর্তের পর মুহূর্ত কেটে যেতে লাগলো।

হঠাৎ খেয়াল হলো কার ডাকে—কে, ঈশ্বর? এখানে বসে পড়ছিস যে?

—প্রদীপে যে বেশী তেল নেই বাবা।

পিতার সঙ্গে বালক ঘরে ফিরে এলো। ঠাকুরদাস হাত মুখ ধুয়ে রান্নার আয়োজন করতে লাগলেন। প্রদীপে যে তেল ছিল তাই দিয়েই কাজ চলতে লাগলো। ঈশ্বর ঘরে বসে আবার পড়ায় মন দিল।

এই হলো ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রজীবন। তপস্যার জীবন।

যে ছেলে একদিন দেশের মানুষকে শিক্ষার আলোক বিতরণ করবে, পড়ার সময় তার ভাগ্যে আলো জোটে না।

নিষ্ঠুর পৃথিবীর এই বুঝি বিধান!

এখন ছেলেকে নতুন করে পড়া শেখাতে হবে—দিতে হবে নতুন স্কুলে।

ঠাকুরদাসের ভাবনা হয়ে গেল। কোথায় কোন্ স্কুলে দেবেন?

কেউ কেউ বললো—ছেলেকে ইংরেজী স্কুলে দাও, বর্তমানে ইংরেজী শিখলেই সুবিধা।

কিন্তু তাতে আবার কেউ কেউ বারণ করলো। বললো—ইংরেজী পড়লে ছেলে তোমার খ্রীষ্টান হয়ে যাবে। তখন ছেলেকে আর খুঁজে পাবে না।

কেউ কেউ আবার গায়ে পড়ে উপদেশ দিতেও এলো—বামুন পণ্ডিতের ছেলে, তাকে আবার ইংরেজী পড়াবার শখ কেন? সংস্কৃত পাঠশালায় ভরতি করিয়ে দাও। সংস্কৃত শিখে দেশে গিয়ে একটা টোল খুলুক। তাতে সবাই সুখ্যাতি করবে। বলবে রামজয় তর্কভূষণের নাতির টোল।

কয়েকজন আবার বললো—ওসব সংস্কৃত শিখে কিছু হবে না। কালের

হাওয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে তো? ছেলেকে হেয়ার সাহেবের স্কুলে ভরতি করিয়ে দাও। চলনসই একটু ইংরেজী শিখলে একটা কাজকর্ম ও নিজেই জুটিয়ে নিতে পারবে।

নানারকম কথা শুনে ঠাকুরদাস একটু বিব্রতই হয়ে পড়লেন। কি করবেন সহসা কিছু ঠিক করতে পারলেন না।

নিজের কথা ভাবতে লাগলেন ঠাকুরদাস। বীরসিংহ গ্রামে একটা চতুষ্পাঠী খুলে অধ্যাপনা করার কল্পনা তাঁরও একদিন ছিল। কিন্তু দারিদ্র্যের জ্বালায় সব কিছু স্বপ্ন তাঁর ঘুচে গেছে। জীবিকা অর্জনের জন্য তাঁকে নেমে আসতে হয়েছে কণ্টকময় পথে। সুখ ভোগের কল্পনা শূন্যে মিলিয়ে গেছে। এখন শুধু রয়েছে কোন প্রকারে বেঁচে থাকার প্রয়াস আর ছেলেকে মানুষ করার চেষ্টা।

কেন এই দুর্ভোগ? নিজে লেখাপড়া বেশী শিখতে পারেননি বলেই তো? পিতা যদি তার প্রতি যত্ন নিতেন তা হলে তার জীবনটা এমন হয়ে যেতো না। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র? তার পিতা তিনি তো নিজে বেঁচে আছেন। ছেলের জীবনটাকে এমনভাবে নষ্ট হতে কি তিনি দিতে পারেন?

সবার পরামর্শ ও উপদেশ নীরবে শুনলেন ঠাকুরদাস। নিজে মাইনে পান দশ টাকা। তাতে ছেলেকে উচ্চশিক্ষা দেওয়া যে কত কঠিন তাও তিনি বুঝতে পারেন। অবশেষে অনেক ভেবে ভেবে স্থির করলেন ছেলেকে তিনি সংস্কৃত শেখাবেন। পরে একটা চতুষ্পাঠী করে দেবেন বীরসিংহ গ্রামে। এখন সমস্যা হলো কোথায় ছেলেকে সংস্কৃত পড়াবেন? চতুষ্পাঠীতে না সংস্কৃত কলেজে?

একদিন দেখা হলো মধুসূদন বাচস্পতির সঙ্গে। তিনি সংস্কৃত কলেজে পড়েন। সম্পর্কে তিনি ঠাকুরদাসের আত্মীয়। তাঁর কাছে পরামর্শ চাইলেন ঠাকুরদাস।

মধুসূদন বললেন—চতুষ্পাঠীতে পড়ে কি হবে? সংস্কৃত কলেজে পড়লেই ভাল সংস্কৃত শিখতে পারবে। তাতে আপনি যে রকমটি চাইছেন সে ভাবেই ছেলেকে তৈরি করতে পারবেন।

ঠাকুরদাস তখন ঈশ্বরচন্দ্রকে সংস্কৃত কলেজেই ভরতি করাবেন স্থির করলেন। সেখানে একদিন গিয়ে দেখা করলেন। সেখানকার ব্যাকরণের অধ্যাপক ছিলেন গঙ্গাধর তর্কবাগীশ। তাঁর কাছে পরামর্শ চাইতেই তিনি বললেন—আপনার ছেলেকে এখানেই ভরতি করিয়ে দিন। আমি আছি, ওর দিকে নজর দিতে পারবো।

তখন ঠাকুরদাসের মনেও উৎসাহ হলো। তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে সংস্কৃত কলেজেই ভরতি করিয়ে দিলেন।

শুরু হলো ঈশ্বরচন্দ্রের নূতন জীবন। তখন তার বয়স মাত্র ন' বছর। এ আর পাঠশালা নয়—কলেজ। সংস্কৃত কলেজ যেমন বড় তেমনি তার

নাম। অভিজাত শিক্ষালয়। কত দেশের কত ছাত্র সেখানে পড়ে আর দিক্‌পাল সব অধ্যাপকরা সেখানে শিক্ষা দেন।

অদ্ভুত এই নূতন পরিবেশে ঈশ্বরচন্দ্র প্রথমে একটু হকচকিয়ে গেলেও মনে খুব উৎসাহ পেল। জ্ঞানলাভের এখানে প্রচুর সুযোগ।

গঙ্গাধর তর্কবাগীশ তৃতীয় শ্রেণীতে ব্যাকরণ পড়াতেন। তাঁর অধ্যাপনায় গভীর নিষ্ঠা ও যত্ন ছিল। তা ছাড়া তিনি ছাত্রদের এত স্নেহ করতেন যে তারা মুগ্ধ না হয়ে পারতো না।

কিছুদিন যেতে না যেতেই ঈশ্বরচন্দ্রের উপর তর্কবাগীশের দৃষ্টি পড়লো। তিনি দেখলেন, এতকাল অনেক ছাত্রই তো পড়িয়েছেন কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের মত এমন ছাত্র তাঁর চোখে পড়েনি। কি অদ্ভুত ছেলেটির স্মৃতিশক্তি, আর পড়া-শোনার ওপর কি গভীর অনুরাগ!

সংস্কৃত কলেজ পটলডাঙা অঞ্চলে। বড়বাজার দয়েহাটা থেকে অনেক দূর। এতটা পথ হেঁটে আসা সহজ নয়। তবু ঈশ্বরচন্দ্র রোজ হেঁটে যাতায়াত করতো। এতে তার কোন ক্লান্তি ছিল না। স্কুলে কামাইও সে করতো না।

প্রথম প্রথম ঈশ্বরচন্দ্রকে ঠাকুরদাস নিজেই কলেজে দিয়ে আসতেন। রোজ সকালে নটায় দিয়ে আসতেন, আর গিয়ে নিয়ে আসতেন বিকেল চারটের সময়।

এ ভাবে চলেছিল দু মাস। তারপর ঈশ্বরচন্দ্র বুঝতে পারলো বাবার খুব কষ্ট হচ্ছে। তাই বললো—বাবা, আমি একাই যেতে পারবো।

ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন খর্বকায়। মাথায় মস্ত এক ছাতা তুলে যখন সে বড়বাজার থেকে কলেজের দিকে যাত্রা করতো তখন দূর থেকে তাকে আর দেখাই যেতো না। মনে হতো শুধু একটি ছাতা পথ দিয়ে চলে যাচ্ছে।

চেহারায় ছোটখাটো, শরীর শীর্ণ, মাথাটা ছিল বড়। সেজন্য বিদ্যালয়ের ছেলেরা তাকে খেপাতো। বলতো—যশুরে কই!

এই যশুরে কই বলার একটি তাৎপর্য ছিল। যশোহরের কই মাছ খুব বিখ্যাত ছিল। আকারেও ছিল খুব বড়। কলকাতায় সেই মাছ প্রচুর পরিমাণে চালান আসতো। কিন্তু কলকাতায় যখন এসে পেঁছতো তখন মাছগুলি রোগা হয়ে পড়তো। মাথাগুলি বড়ই থাকতো।

সেই চেহারার সঙ্গে তুলনা করা হতো ঈশ্বরচন্দ্রের। তাই ছেলেরা খেপাতো—যশুরে কই! কখনো বা একটু কায়দা করে বলতো...কসুরে জই!

সে কথা শুনে ঈশ্বরচন্দ্রের ভয়ানক রাগ হতো। কিন্তু সে ছিল তোতলা। বেশী রাগলে মুখ দিয়ে কথা বেরুতো না। তাই সে শুধু রুখেই যেতো—কিছু বলতে পারতো না।

সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র। ক্লাসের মধ্যে সব চেয়ে ভাল ছাত্র। শিক্ষার ওপর নিষ্ঠা এবং তার প্রতিভার পরিচয় পেয়ে শিক্ষকরা বিস্মিত।

কিন্তু এর পেছনে আছে পিতা ঠাকুরদাসের অক্লান্ত চেষ্টা ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

সিংহী-বাড়ির একতলার ছোট্ট একটি ঘরে ঠাকুরদাস বাস করেন ছেলেকে নিয়ে। দরিদ্র শীর্ণদেহ ব্রাহ্মণ। ঘুমান একটি অতি সাধারণ বিছানায়। একই সংকীর্ণ বিছানায় একপাশে ঘুমায় তাঁর ছেলে। ছেলেও রোগা, খাটো। অতি সাধারণ চেহারা, গরিবের মত বেশভূষা।

ঘরে জায়গা নেই। বিছানাতেই মাথার দিকে গোছানো কয়েকটি সংস্কৃত বই।

বাড়ির কাছেই আর্মানি গীর্জা।

গীর্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজে। ঠাকুরদাসের ঘুম ভেঙে যায়।

কলকাতা শহর তখন নিস্তব্ধ, সবাই ঘুমিয়ে আছে। রাত দুটো। ঠাকুরদাস বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েন। ঘরের এক কোণে রেড়ির তেলের প্রদীপটি জ্বালান। তারপর ছেলের গায়ে হাত দিয়ে ডাকেন—ঈশ্বর, ওঠ্, পড়তে বস্।

পিতার ডাকে ঈশ্বরের ঘুম ভেঙে যায়। কিন্তু ঘুমের আবেশ চোখ থেকে যায় না।

পিতা আবার ডাকেন—ওঠ্—উঠে চোখে মুখে জল দে।

তখন আর বিছানায় পড়ে থাকা চলে না ঈশ্বরের। সে উঠে পড়ে। চোখে মুখে জল দিয়ে বই খুলে বসে যায় সেই মিটমিটে আলোর সামনে। শুরু হয় অধ্যয়নের তপস্যা।

ধীরে ধীরে রাত কেটে যায়। আকাশে ফুটে ওঠে ভোরের আলো কিন্তু একতলার ওই ছোট ঘরে সেই আলোক প্রবেশ করতে পারে না। বালক প্রদীপের আলোতেই পড়তে থাকে।

আকাশে আলো আরো স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠতেই ঠাকুরদাস বলেন—বাতি এখন নিবিয়ে দে।

বাতিটা নিবিয়ে হাত মুখ ধুয়ে এসে আবার পড়তে বসতো ঈশ্বরচন্দ্র।

ঠাকুরদাস ব্যাকরণ ভালই জানতেন। তাই নিজে ছেলের পড়ার দিকে নজর রাখতেন। কলেজে কি পড়িয়েছে তার খবর রোজ নিতেন ঠাকুরদাস। ঈশ্বরচন্দ্র রোজ রাত্রে বাবার কাছে কলেজের পড়া মুখস্থ বলতো। কোন জায়গায় ভুল হলে ঠাকুরদাস তা শুদ্ধ করে বুঝিয়ে দিতেন।

ছেলেকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য দরিদ্র পিতার কি কঠোর পরিশ্রম, কি প্রাণান্তকর চেষ্টা!

ঠাকুরদাস কর্মস্থল থেকে বাসায় ফিরতেন রাত ন'টার পর। উনুন ধরিয়ে রান্না করতেন। রান্না হয়ে গেলে ছেলেকে খাইয়ে তারপর নিজে খেতেন।

তখনকার দিনে কয়লার প্রচলন ছিল না। চেলাকাঠ দিয়ে রান্না করতে

হতো। কাঠ সেরূপ শুকনো না থাকলে কোন কোন দিন রান্না করতে কষ্ট হতো খুব। তবু ঠাকুরদাসের কোন ক্লান্তি বা বিরক্তি ছিল না। খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে গেলে দুজনে এক সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়তেন।

আবার রাত দুটো বাজলেই উঠে পড়তে হতো। ছেলেকে নিয়ে বসতেন। মুখে মুখে শেখাতেন অনেক ভাল ভাল সংস্কৃত শ্লোক।

এতটুকু ছেলে তার শরীরেই বা কত সয় আর মাথাতেই বা কত ধরে? কোন কোন দিন ঈশ্বরচন্দ্র পড়তে পড়তে রাত্রে ঘুমিয়ে পড়তো।

সেদিন হতো ভয়ানক কান্ড। রাত্রে কাজ থেকে ফিরে ঠাকুরদাস ছেলেকে ঐ অবস্থায় দেখে বিষম চটে যেতেন। চড় চাপড় মেরে ও কানমলা দিয়ে তাকে উঠিয়ে দিতেন ঘুম থেকে।

কোন কোন দিন প্রহারের মাত্রা খুব বেড়ে যেত। চেলাকাঠ নিয়ে মারতে শুরু করতেন। বাবার হাতে মার খেয়ে ঈশ্বরচন্দ্র এমন কাতর আর্তনাদ করতে থাকতো যে বাড়ির অন্যান্য লোকেরা ছুটে আসতো। বলতো—আহা, করছেন কি? অমন কচি ছেলেকে মারছেন কেন?

রাইমণি ছুটে আসতেন অন্দরমহল থেকে। প্রহারে জর্জরিত ঈশ্বরচন্দ্রকে টেনে নিতেন নিজের কাছে। ঠাকুরদাসকে বলতেন—ইস্, এমন মারও মারতে পারেন আপনি? শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মহত্যা করবেন নাকি?

ঠাকুরদাস তখন নিরস্ত হতেন।

এই বাড়িতে অসহায় ঈশ্বরচন্দ্রের একমাত্র আশ্রয় ও সান্ত্বনার স্থল রাইমণি। মায়ের স্নেহ দিয়ে তিনি ঘিরে রাখেন বালককে। মা কাছে নেই—ঠাকুরমাও কাছে নেই। সে সব কথা মনে হলে ঈশ্বরের মন খুব খারাপ হয়ে যায়। সময় সময় কান্না পায়। তখন এই রাইমণির কথা মনে হলেই মনে সান্ত্বনা জাগে।

পিতার শাসনে ঈশ্বরকে সব সময়েই সন্ত্রস্ত থাকতে হতো। সন্ধ্যার পর যখন ঘুম জড়িয়ে আসতো দু চোখে তখন ঘুম তাড়াবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠতো সে। কিন্তু যখন কিছুতেই ঘুমকে তাড়াতে পারতো না, তখন দু চোখে দিত সরষের তেল। তাতে চোখ জ্বালা করতো—ঘুমও পালিয়ে যেতো।

ভারী একগুঁয়ে ছিল ঈশ্বরচন্দ্র। নিজে যা ভাল মনে করতো তাই করতো। কেউ উপদেশ দিলেও সহজে গ্রাহ্য করতো না।

যেদিন পরিষ্কার কাপড় না থাকতো সেদিন সে জেদ ধরতো ফর্সা কাপড় পরে বিদ্যালয়ে যাবে।

যেদিন স্নান করার ইচ্ছা না হতো সেদিন ঠাকুরদাস মেরেও তাকে স্নান করাতে পারতেন না। টাঁকশালের ঘাটে তাঁরা স্নান করতেন। ঠাকুরদাস জোর করে জলে নামিয়ে দিলেও দাঁড়িয়ে থাকতো। অনেক চড়চাপড় মেরে তবে তাকে স্নান করাতেন।

এজন্য ঠাকুরদাস ঈশ্বরচন্দ্রের নাম দিয়েছিলেন 'ঘাড় কেঁদো'। অর্থাৎ ঈশ্বরচন্দ্র একবার ঘাড় বাঁকালে সে ঘাড় সহজে সোজা হতো না।

ব্যাকরণের ক্লাসে ঈশ্বরচন্দ্র ছিল সেরা ছাত্র। গঙ্গাধর তর্কবাগীশও অবাক্ হয়ে যেতেন পড়াতে গিয়ে। এমন ছাত্র কোনদিন তাঁর চোখে পড়েনি।

তখন খুব নজর দিলেন ঈশ্বরের দিকে। ক্লাসের বাইরেও অনেক কিছু শেখাতে লাগলেন। মুখে মুখে অনেক উদ্ভট শ্লোক বলতেন। ঈশ্বরচন্দ্র তন্ময় হয়ে শুনতো। শুনতে শুনতেই তার সব মুখস্থ হয়ে যেতো। অনর্গল মুখে মুখে সেগুলি আবৃত্তি করে আবার সে শোনাতো তর্কবাগীশকে। ঈশ্বরচন্দ্রের এমন অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি দেখে তর্কবাগীশ মুগ্ধ না হয়ে পারতেন না।

সাবাস ছেলে! প্রবীণ অধ্যাপক মনে মনে ভাবতেন, এককালে দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত হবে এই ছেলে।

তর্কবাগীশের কাছ থেকে ও বাবার কাছ থেকে এভাবে মুখে মুখে প্রায় চার পাঁচশো শ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র শিখে ফেললো। শুধু শ্লোক নয়, শ্লোকের অর্থও শিখলো।

ছ মাস পরেই একটা পরীক্ষা দিতে হয়।

সেই পরীক্ষায় সব চেয়ে বেশী নম্বর পেল ঈশ্বরচন্দ্র। শুধু বেশী নম্বর নয়, তার অদ্ভুত কৃতিত্বও প্রকাশ পেল। তার ফলে সে লাভ করলো পাঁচ টাকা বৃত্তি।

ছেলে বৃত্তি পেয়েছে, সে খবর শুনে ঠাকুরদাসের কি আনন্দ। ছেলেকে আরও উৎসাহ দিতে লাগলেন। বললেন—আরো ভালো করে পড়াশোনা কর ঈশ্বর, তা হলে আমাদের বংশের মান রাখতে পারবি।

শুধু কি বংশের মান! দেশের মান রাখবে যে এই ছেলেটি। তাই তার পড়াশোনায় ক্লান্তি নেই—অন্য কোন দিকে তার খেয়াল নেই। অধ্যয়নই তার তপস্যা।

তিন বছর পড়তে হয় ব্যাকরণের শ্রেণীতে। দু বছরের পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখিয়ে অনেকগুলি পুরস্কার পেল ঈশ্বরচন্দ্র।

ঠাকুরদাসের মনে যেমন আনন্দ, অধ্যাপকদেরও তেমন গর্বের অন্ত নেই। এমন ছেলেই তো বিদ্যালয়ের গৌরব।

কিন্তু এক বছরের পরীক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্র ভাল পুরস্কার পেল না। তাতে তার মনে খুব দুঃখ হলো।

কলেজ থেকে বাসায় এসে বললো—আমি আর কলেজে পড়বো না বাবা।

ঠাকুরদাস অবাক্ হয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন—কেন পড়বি না?

ঈশ্বরচন্দ্র বললো—এবার একটি বাজে ছেলেকে ভাল প্রাইজ দিয়েছে, আমাকে দেয়নি। দেশে গিয়ে বিশ্বনাথ সার্বভৌম পিসামশায়ের টোলে পড়বো।

ঠাকুরদাস অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে ছেলেকে শান্ত করলেন। কলেজের তর্কবাগীশ ও বাচস্পতি মহাশয়ও তাকে বললেন—এবার ভাল হয়নি তাতে হয়েছে কি? আরও তো বছর সামনে রয়েছে।

সেবার ভাল প্রাইজ না পাবার অন্য একটি কারণ ছিল। ঐ বছর প্রাইস সাহেব পরীক্ষক ছিলেন। সাহেব ভাল বুঝতে পারতেন না। ঈশ্বরচন্দ্র যা উত্তর দিত, ভালরূপ বিবেচনা করে উত্তর দিত। সেজন্য তা নির্ভুল হতো। কিন্তু যে ছাত্রটি বিবেচনা না করেই তাড়াতাড়ি বলেছিল, তা ভালই হোক আর মন্দই হোক, সাহেব তাকে ভাল ছাত্র বিবেচনা করে বেশী নম্বর দিয়েছিলেন।

তাছাড়া ঈশ্বরচন্দ্রের তোতলামি দোষ ছিল বলে সাহেব হয়তো তার কথা ভালো বুঝতে পারেননি।

চার

ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স হলো এগারো বছর।

ছেলের উপনয়ন দিতে হবে। ঠাকুরদাস তার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। ছেলেকে নিয়ে এলেন গাঁয়ের বাড়িতে। যথারীতি অনুষ্ঠান সহকারে উপনয়ন হয়ে গেল। গাঁয়ের সমাজের লোককে নিমন্ত্রণ করা হলো। ভূরি-ভোজনে আপ্যায়িত হল সবাই।

গাঁয়ে এলে ঈশ্বরচন্দ্রের কতই না আনন্দ! ছোটবেলার খেলার সাথীদের সঙ্গে দেখা হতো। ছুটে যেতো 'শচীবামনী' পুকুরের ধারে। এই বড় পুকুরটির পাড়ে কত খেলাই না করতো সে।

তার সঙ্গীদের মধ্যে গদাধর পালই ছিল বয়সে বড়, গায়ের জোরও ছিল তার বেশী। গায়ের জোরে না পারলেও কায়দায় ঈশ্বরচন্দ্র গদাধরকে কাবু করতো। কপাটি খেলার সময় সে গুঁড়ি মেরে গদাধরের দুই পায়ের মধ্যের ফাঁকটায় ঢুকে গিয়ে তাকে চিৎ করে ফেলে দিত। তারপর তার বুকের ওপর উঠে ঈশ্বরচন্দ্র হাসতো হি-হি করে।

ছেলেরাও এই দৃশ্য দেখে হাততালি দিত আর হইহই করে উঠতো। কি মজাই হতো তখন!

এত আনন্দের পর তাই বাড়ি ছেড়ে চলে আসবার সময় খুবই খারাপ লাগতো তার।

সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণ পড়া শেষ হলো ঈশ্বরচন্দ্রের। এবার তাকে সাহিত্যের শ্রেণীতে ভরতি করিয়ে দেওয়া হলো।

ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স তখন বারো।

জয়গোপাল তর্কালংকার ছিলেন সাহিত্যের অধ্যাপক। তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখে বললেন—এতটুকু ছেলে সাহিত্য শ্রেণীতে ভর্তি হবে কি! সংস্কৃত সাহিত্যের সে কি বুঝবে?

ঈশ্বরচন্দ্র বললো—বেশ, আমাকে পরীক্ষা করে নিন।

বিস্মিত হয়ে গেলেন অধ্যাপক। অন্যান্য অধ্যাপকরা কিছুটা রুষ্ট হলেন। গর্বিত ছেলে শিক্ষকের মুখের ওপর এমন ভাবে কথা বলে!

জয়গোপাল বললেন—বেশ, পরীক্ষাই দাও। কালিদাসের 'কুমার-সম্ভব' পড়েছ?

—হ্যাঁ পড়েছি।

—একটা শ্লোক মুখস্থ বল তো।

ঈশ্বরচন্দ্র একটুও ইতস্ততঃ না করে গড়গড় করে একটি শ্লোক মুখস্থ বলে গেল।

জয়গোপাল বললেন—এর ব্যাখা করতে পারবে?

ঈশ্বরচন্দ্র ব্যাখ্যাও বলে গেল। আরো কয়েকটি প্রশ্ন করলেন জয়গোপাল। সব প্রশ্নের জবাবই ঈশ্বরচন্দ্র ঠিক ঠিক দিল। অধ্যাপকরা শুনে সবাই বিস্মিত হয়ে গেলেন। আর কোন পরীক্ষা দিতে হলো না। ঈশ্বরচন্দ্র সাহিত্যের শ্রেণীতে ভরতি হয়ে গেল।

কিছুদিনের মধ্যেই তর্কালংকারের অতি প্রিয় ছাত্র হয়ে উঠলো ঈশ্বরচন্দ্র। তিনি নিজের পুত্রের মত স্নেহে তাকে শিক্ষা দিতে লাগলেন।

প্রথম বছরেই ঈশ্বরচন্দ্র রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ও রাঘব পান্ডবীয় প্রভৃতি কাব্য ও সাহিত্য অতি মনোযোগের সঙ্গে পড়ে শেষ করে ফেললো। পরীক্ষায় সব ছাত্রের চেয়ে বেশী নম্বর পেয়ে পুরস্কারও লাভ করলো।

দ্বিতীয় বছরে মাঘ, ভারবি, মেঘদূত, শকুন্তলা, উত্তরচরিত, বিক্রমোর্বশী, মুদ্রারাক্ষস, কাদম্বরী, দশকুমার চরিত প্রভৃতি গ্রন্থ পড়া হয়ে গেল।

কাব্যগুলি আগাগোড়া তার কণ্ঠস্থ। সংস্কৃত নাটকগুলির অংশের পর অংশ অনর্গল সে বলে যেতে পারে।

এ ছাড়াও তার কত গুণ। হাতের লেখা মুক্তোর মত। প্রতি বছর এজন্য সে পুরস্কারও পায়।

দ্বিতীয় বছরের পরীক্ষা শেষ হলো। সবচেয়ে বেশী নম্বর পেয়ে ঈশ্বরচন্দ্র অধিকার করলো প্রথম স্থান।

ছাত্ররা ঈর্ষান্বিত, অধ্যাপকরা বিস্মিত।

ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রজীবন যেন এক ইতিহাসের কাহিনী।

দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে চলে তার অধ্যয়নের সাধনা।

কোনদিন দু বেলা অন্ন জুটতো, কোনদিন জুটতো না। যখন জুটতো, তখনও সব সময় পেট ভরে খেতে পারতো না। যখন পেট ভরে খাওয়ার মত ভাত জুটতো তখন জুটতো না ডাল বা তরকারি। কেবল নুন ভাত খেয়ে তখন দিন কাটাতে হতো। যখন তরকারি ও মাছ পাওয়া যেত তখন মাছের ঝোল রেঁধে শুধু ঝোল দিয়ে ভাত খেতে হতো। মাছ রেখে দেওয়া হতো অন্য বেলার জন্য। কোনদিন রাত্রে শুধু তরকারি দিয়ে খেয়ে মাছ পরের দিনের জন্য রেখে দেওয়া হতো। পরের দিন সেই মাছ দিয়ে রাঁধা হতো অম্বল। এই ভাবেই তাদের দিন চলতো।

ঈশ্বরচন্দ্রের আর এক ভাই ছিল, তার নাম দীনবন্ধু। ঠাকুরদাস কিছুদিন পর তাকেও লেখাপড়া শেখাবার জন্য কলকাতা নিয়ে এলেন।

প্রথম প্রথম অনেকদিন ঠাকুরদাস নিজেই রান্না করতেন। তারপর ঈশ্বরচন্দ্রের ওপর সেই ভার পড়লো।

শুধু কি রান্না! আরও অনেক কাজ করতে হতো তাকে। প্রত্যেকদিন সকালে স্নান করে বাজারে যেতো। বাবা যে ভাবে বলে দিতেন সে ভাবে মাছ ও তরিতরকারি কিনে নিয়ে আসতো। তারপর বসতো শিল নোড়া নিয়ে মসলা বাটতে। নিজের হাতে কাঠ চেলা করতো। তারপর উনুন ধরিয়ে রান্নার ব্যবস্থা করতো।

এতদিন ছিল তিনজন, এবার হলো চারজন। ঠাকুরদাসের ভাই কালিদাস এসে হাজির হলেন। চারজনের রান্নাই ঈশ্বরচন্দ্রকে করতে হতো। সবাইকে খেতেও দিতো সে নিজের হাতে।

কাজ কি কম! হলুদ বাটা, বাসন মাজা, কাঠ চেলা করা ইত্যাদি করতে করতে ঈশ্বরের হাতের নখ অনেকটা খয়ে গিয়েছিল।

এতসব কাজ করেও তাকে পড়াশোনা করতে হতো। যেমন তেমন ভাবে পড়া নয়। অন্যান্য ছেলেদের চেয়ে সে অনেক বেশী পড়াশোনা করতো। এই বয়সে এত পরিশ্রম করা সহজ কথা নয়।

এক আশ্চর্য জীবনের দৃষ্টান্ত ঈশ্বরচন্দ্র!

যে ঘরে রান্না করতো, সে ঘরটি ছিল অন্ধকার ও নোংরা। একতলার ঘর, তার ওপর কোন জানলা না থাকায় আলো ঢুকতে পারতো না। কাছেই ছিল দুটি পায়খানা। তাই সব সময় নাকে দুর্গন্ধ আসতো। মাঝে মাঝেই সাদা ক্রিমির মত পোকা কিলবিল্ করে ঢুকতো সেই ঘরে। রান্না করার সময় ঈশ্বরচন্দ্র ঘটিতে জল নিয়ে বসতো। পোকাগুলি ঘরে ঢুকতে গেলেই জল ঢেলে সেগুলিকে সরিয়ে দিতো।

তা ছাড়াও ঘরে ছিল আরশোলার আড্ডা। ঘরময় আরশোলা ঘুরে বেড়াতো। কত সময় রান্না করা জিনিসের ওপর এসে পড়তো।

একদিন তরকারি রান্না করার সময় কড়াইতে একটি আরশোলা পড়ে গিয়েছিল। অন্ধকারের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র তা দেখতে পায়নি। ধরা পড়লো খাবার সময় তরকারি বাড়তে গিয়ে। তখন সে পড়লো ভারী মুশকিলে। ফেলে দিলে সবাই দেখতে পাবে, তখন সবার ঘেন্না হবে খাবার জিনিসের ওপর। কারুর হয়তো সেদিন খাওয়াই হবে না। তাই ঈশ্বরচন্দ্র তরকারির সঙ্গে নিজের পাতে আরশোলাটি তুলে নিল। তারপরেও ইচ্ছা করলে সে ফেলে দিতে পারতো, কিন্তু ফেলে দিল না। দেখে ফেললে সকলের খাওয়া নষ্ট হবে, তাই ভাতের সঙ্গে মেখে আরশোলাটি খেয়ে ফেললো।

এত পরিশ্রম তার ওপর আহার ছিল অতি সাধারণ। কোন কোনদিন

শুধু ক্ষুধা মেটাবার জন্যই যেন খাওয়া হতো। আবার কোনদিন হয়তো ক্ষুধা মিটতোই না।

এত পরিশ্রম করেও তার মনে বিরক্তি ছিল না। প্রতিদিন সব কাজ ঠিকমত করতো। কারুর ওপর কোন অভিমানও সে করতো না।

বিশ্রাম করার মত অবসর তার ভাগ্যে জুটতো খুবই কম। দিনরাত এত পরিশ্রম করার পর ভাল ভাবে যে ঘুমাবে, তারও কোন ব্যবস্থা ছিল না। একটি সংকীর্ণ ঘরে কোন রকমে শুয়ে রাত কাটাতো।

রাতের বেলা রান্না অবশ্য ঠাকুরদাসই করতেন। তবু সকালবেলার রান্নায় অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে যেতো বলে ঈশ্বরচন্দ্রের পড়াশোনার ক্ষতি হতো খুব। কাজ সেরে বই নিয়ে বসতে না বসতেই কলেজের সময় হয়ে যেতো। তখন তাড়াতাড়ি বইপত্র গুছিয়ে নিয়ে খেয়ে-দেয়ে রওনা হতো।

পথে চলতে চলতে অনেক সময় বই খুলে তাকে পড়তে দেখা গেছে।

ঈশ্বরচন্দ্রের জীবন—অতি কঠোর পরিশ্রমের জীবন।

পরনে ছিল তার মোটা কাপড় ও চাদর। তার মা চরকায় সুতো কেটে, কাপড় তৈরি করে কলকাতায় পাঠাতেন। সেই কাপড় ও চাদর সব সময় ব্যবহার করতো ঈশ্বরচন্দ্র। অতি সাদাসিধে ছিল তার ছাত্রজীবনের পরিচ্ছদ। ভাল জামাকাপড় পরার বা বিলাসিতা করার কোন সুযোগও সে-সময়ে ছিল না। সেরূপ ইচ্ছাও মনে ছিল না তার। মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়কেই সে পরম গৌরবের সামগ্রী মনে করতো।

শুধু ছাত্রজীবনে নয়, সারাজীবনেই ছিল ঈশ্বরচন্দ্রের পরনে অতি সাধারণ বেশভূষা—ধুতি ও চাদর। পায়ে সাধারণ চটি।

পাঁচ

ঈশ্বরচন্দ্র এখন বড় হয়েছেন। সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য শ্রেণীর পড়া শেষ হয়েছে। তাঁর নাম এখন ছাত্র ও অধ্যাপকদের মুখে মুখে। যে রকম কৃতিত্বের সঙ্গে তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন, তাতে তাঁর খ্যাতিও ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

অনেকেই বলে, ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে মস্ত বড় পণ্ডিত হবে। বাংলা ভাষার মত সংস্কৃত ভাষায়ও কি অনর্গল কথা বলার ক্ষমতা! এ কি সহজ কথা!

ঠাকুরদাস একদিন ছেলেকে ডাকলেন। বললেন—আমার ইচ্ছা তুমি সংস্কৃত কলেজের পড়া শেষ হলে বীরসিংহ গ্রামে গিয়ে টোল খোল। বাবারও তাই ইচ্ছা ছিল।

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন—বেশ, তাই করবো।

ঠাকুরদাস বললেন—আমাদের গ্রামের ও আশপাশের গ্রামের গরিব ছেলেরা তোমার সেই টোলে পড়বে।

—হ্যাঁ, আমারও তাই ইচ্ছে।

—তোমার কলেজের বৃত্তির টাকা দিয়ে দেশে কিছু জমি কেনো। সেখানে টোল হবে। তা ছাড়া জমির আয় থেকে বাইরের ছাত্রদের থাকা খাওয়ার খরচ পুষিয়ে যাবে।

ঈশ্বরচন্দ্র দেখলেন বাবা যা বলছেন তা মন্দ নয়। তাই তিনি রাজী হলেন। জমি কেনার জন্যও গাঁয়ের আশেপাশে নানা জায়গায় খোঁজখবর করতে লাগলেন।

বীরসিংহ গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্রের খ্যাতির কথা গিয়ে পেঁছিতেই অনেকে ভগবতী দেবীকে ধরে বসলো। বললো—তোমার ছেলে তো পণ্ডিত হয়েছে, এবার বিয়ে দাও।

তখনকার দিনে ছোট বয়সেই বিয়ে করার প্রচলন ছিল। তাই ভগবতী দেবী টুকটুকে একটি বউ ঘরে আনবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সেই খবর ঠাকুরদাসকে জানাতে ঠাকুরদাসও উদ্যোগী হয়ে উঠলেন। খোঁজখবর করতে লাগলেন চারদিকে।

ঠাকুরদাসের পণ্ডিত ছেলে বিয়ে করবে—সে খবর শুনে অনেক জায়গা থেকেই পাত্রীর খবর আসতে লাগলো। ঘটকরাও অনেক খবর নিয়ে এলো।

ঠাকুরদাস অনেক মেয়ে দেখলেন, কিন্তু পছন্দ হলো না। শেষে দেখলেন ক্ষীরপাই-এর একটি মেয়ে। শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্যের নাম তিনি আগেই শুনেছেন। তাঁর মেয়েটিকে দেখে পছন্দও হলো।

ঈশ্বরচন্দ্রের কিন্তু বিয়ে করার মোটেই ইচ্ছে নেই। তাঁর বয়স তখন মোটে চৌদ্দ বছর।

তাঁর ইচ্ছা, সারাজীবন লেখাপড়া শিখবেন, দেশের কল্যাণের জন্য কাজ করবেন। বিয়ে করার কল্পনাও তাঁর মাথার মধ্যে নেই। কিন্তু বাবা কাকা ও বাড়ির সকলের অনুরোধ মোটেই এড়াতে পারলেন না। বিশেষ করে মা মনে খুব কষ্ট পাবেন এই চিন্তা করেই ঈশ্বরচন্দ্র রাজী হলেন।

ক্ষীরপাই-এর শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য নামী লোক। বিষয় সম্পত্তিও আছে। মেয়ে দীনময়ী সুন্দরী ও গুণবতী। ঠাকুরদাসের অবস্থা তিনি জানতেন। তবু তাঁর ছেলের হাতে মেয়ে তুলে দিতে তাঁর কোন আপত্তি হলো না। ঠাকুরদাসকে বললেন—বাঁড়ুয্যে, তোমার ধন নেই তা জানি, কিন্তু তোমার ছেলে গুণবান্, কেবল এই জন্যই আমার মেয়েকে তোমার ছেলের হাতে দিলাম।

শুভদিন দেখে বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর ঈশ্বরচন্দ্র আবার কলকাতায় ফিরে গেলেন।

এরপর তিনি ভরতি হলেন অলংকার শ্রেণীতে।

অন্যান্য ছাত্রদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রই ছিলেন বয়সে সবার ছোট। কিন্তু ছোট হলে হবে কি, জ্ঞানে সবার চেয়ে জ্যেষ্ঠ। এক বছরের মধ্যেই তিনি সাহিত্য-দর্পণ, কাব্যপ্রকাশ, রসগঙ্গাধর প্রভৃতি অলংকার শাস্ত্রের কঠিন গ্রন্থগুলি পড়ে শেষ করলেন।

পণ্ডিত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ ছিলেন অলংকারের অধ্যাপক। তিনি ঈশ্বরচন্দ্রের মেধা দেখে বিস্মিত হলেন। তাঁর বুঝতে বাকী রইলো না যে বয়সে কনিষ্ঠ এই ছেলেটিই একদিন সব ছেলেদের ছাড়িয়ে যাবে।

তাঁর অনুমান সত্য হলো। বাৎসরিক পরীক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্র প্রথম স্থান অধিকার করলেন। তখন পারিতোষিক দেওয়া হতো বই ও নগদ টাকা। ঈশ্বরচন্দ্র পেলেন সাতখানা বই।

বই পেয়ে সেদিন তাঁর কি আনন্দ!

ঠাকুরদাস সেদিন অন্যদিনের চেয়ে একটু আগেই বাড়ি ফিরলেন। কিন্তু এসে দেখেন ঈশ্বরচন্দ্র ঘরে নেই। কোথায় গেল ঈশ্বর?

খুব রাগ হলো তাঁর। ডাকতে লাগলেন, ঈশ্বর—ঈশ্বর—

ডাক শুনে ওপর তলা থেকে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন ঈশ্বরচন্দ্র। হাতে তাঁর এক গাদা বই। ঠাকুরদাসের পায়ের কাছে বইগুলি রেখে প্রণাম করে বললেন—বাবা, অলংকার পরীক্ষায় আমি প্রথম হয়েছি, তাই এই প্রাইজ পেয়েছি আমি।

বইগুলো দেখে ঠাকুরদাসের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। আনন্দে ভরে উঠলো বুক।

দীনবন্ধু এমন সময় কাছে এসে দাঁড়ালো। তার দিকে তাকিয়ে ঠাকুরদাস বললেন—দ্যাখ্, চেয়ে দ্যাখ্, ঈশ্বর কত বই পুরস্কার পেয়েছে। তুই তো পড়বি না, কেবল ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দিন কাটাবি।

দীনবন্ধু বাবার কথা শুনে লজ্জায় মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলো।

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন—না বাবা, ও পড়াশোনায় খুব ভালো। দেখবে, ও একদিন প্রাইজ পাবে।

এমন সময় সেখানে এসে হাজির হলেন রাইমণি। তাঁর হাতে একখানি রুপোর থালা। থালার ওপর কয়েকটি টাকা, একজোড়া গরদের ধুতি চাদর আর রুপোর গেলাস বাটি।

ঠাকুরদাস অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—এ সব কি?

রাইমণি বললেন—দাদা এসব ঈশ্বরকে দিলেন। দাদা বলেছেন—ঈশ্বরচন্দ্র যে সুনাম পেয়েছে তাতে আমাদের বাড়িরও সুনাম বাড়লো। ওকে আমাদেরও পুরস্কার দেওয়া উচিত। তাই তিনি এসব পাঠিয়ে দিয়েছেন।

কৃতজ্ঞতায় ঈশ্বরচন্দ্রের মন ভরে উঠলো। ঠাকুরদাসও আনন্দে যেন নির্বাক্ হয়ে গেলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র নূতন উদ্যম নিয়ে পড়াশোনা করতে লাগলেন। যতই দিন যায় তার মেধাশক্তিও বাড়তে থাকে।

ঠনঠনিয়ায় থাকেন তারানাথ তর্কবাচস্পতি।

তাঁর বাড়িতে মাঝে মাঝেই অনেক পণ্ডিত ও গুণী ব্যক্তিরা সমবেত হতেন। একদিন বাচস্পতি ঈশ্বরচন্দ্রকে তাঁর বাড়িতে যাবার জন্য অনুরোধ করলেন।

গেলেন ঈশ্বরচন্দ্র। বাচস্পতি তাঁকে সাহিত্য-দর্পণ আবৃত্তি করতে বললেন। ঈশ্বরচন্দ্র আবৃত্তি করলেন।

কি সুললিত কণ্ঠস্বর! কি মধুর আবৃত্তি! কি অপূর্ব বাচনভঙ্গী!

উপস্থিত সকলেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন। দর্শনের বিখ্যাত অধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আবৃত্তি শুনে এত অভিভূত হয়ে পড়লেন যে ঈবরচন্দ্রের পিঠ চাপড়ে বললেন—সাবাস।

তারপর তারানাথকে লক্ষ্য করে বললেন—এত ছোট ছেলে যে সাহিত্য-দর্পণের এমন সুন্দর আবৃত্তি করতে পারে তা আমার কল্পনার বাইরে। বড় হলে এই ছেলে বাংলাদেশের একটি রত্ন হবে, এ আমি তোমাকে বলে রাখলাম বাচস্পতি।

সবাই এক বাক্যে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রশংসা করতে লাগলেন।

ঠাকুরদাস বাড়ি যাবেন। বললেন—ঈশ্বর, যখন যা বৃত্তির টাকা পেতিস প্রায় সবই তো আমার হাতে তুলে দিয়েছিস। সেগুলো আমি জমিয়ে রেখেছি। এবার গিয়ে একখণ্ড জমি কিনবো ভাবছি।

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন—হ্যাঁ, তাই করো বাবা!

ঠাকুরদাস বললেন—টোলের জন্য দেখে শুনে একটু ভাল জমি কিনতে হবে। আর তুই কিছু পুঁথিপত্র এখন থেকেই কিনে রাখ। টোল করলে দরকার হবে যে।

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন—আচ্ছা, তাই করবো।

ঠাকুরদাস দেশে গিয়ে কাঁচিয়া গ্রামে কিছু জমি কিনলেন। ঈশ্বরচন্দ্র হাতে লেখা কিছু পুঁথিও সংগ্রহ করতে লাগলেন।

বাবা টিফিনের জন্য কোন পয়সা ঈশ্বরচন্দ্রকে দিতে পারতেন না। তাই নিজেরই ব্যবস্থা করতে হতো। বৃত্তির টাকা যা উদ্বৃত্ত থাকতো তাই দিয়ে জলখাবার খেতেন।

কিন্তু শুধু একলা খেয়ে তাঁর তৃপ্তি হতো না। সহপাঠীদের মধ্যে যারা তাঁর কাছে থাকতো তাদেরও খাওয়াতেন। কম পয়সায় যা জুটতো ভাগাভাগি করে খেয়ে তাতেই তাঁর আনন্দ। কোনদিন হয়তো তাঁর ভাগ্যে কিছু জুটতো না। তাতেও মনে কোন দুঃখ ছিল না তাঁর।

কোন সহপাঠীর অসুখ হয়েছে শুনলে ঈশ্বরচন্দ্র চঞ্চল হয়ে উঠতেন। ছুটে যেতেন তাকে দেখবার জন্য। নিজের হাতে সেবা-শুশ্রূষা করতেন। পাড়ায়ও তাঁর সমবয়সী কোন ছেলের অসুখ হয়েছে জানতে পারলে গিয়ে উপস্থিত হতেন সেখানে।

কারও কোন সংক্রামক রোগ হলে অনেকেই রোগীর কাছে যেতে ভয় পেতো কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের কোন ভয় ছিল না। তিনি বিনা সংকোচে রোগীর কাছে যেতেন। তার মলমূত্র পরিস্কার করতেও কুণ্ঠিত হতেন না।

ঈশ্বরচন্দ্র তখনো বিদ্যাসাগর হননি, কিন্তু দয়ার সাগর হওয়ার সূচনা তখনই তাঁর চরিত্রে দেখা দিয়েছিল।

তার এক জীবন-চরিতকার বলেছেন—"কুকুর, বিড়ালটি মরিলেও তাঁহার চক্ষে জল ঝরিত।"

ছয়

অলংকার শাস্ত্রের পরীক্ষাতেও ঈশ্বরচন্দ্র সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করলেন। পরপর সব বিভাগেই প্রথম। এমন কৃতিত্ব এর আগে কোন ছাত্রই সংস্কৃত কলেজে দেখাতে পারে নি।

কমবয়সী খর্বকায় একটি ছেলে যে সমস্ত ছাত্রকে এমন ভাবে পেছনে ফেলে চলে যাবে এ কল্পনা কেউ কখনো করতে পারে নি।

কিন্তু ঐ ক্ষীণ দুর্বল শরীরে এত পরিশ্রম সহ্য হবে কেন? পরীক্ষার কিছুদিন পরেই ঈশ্বরচন্দ্র অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কঠিন অসুখ। মলের সঙ্গে রক্ত পড়তে লাগলো। কলকাতার চিকিৎসায় যখন কোন আরাম হলো না, তখন ঠাকুরদাস চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

কয়েকজন তাঁকে পরামর্শ দিল—ঈশ্বরকে দেশে পাঠিয়ে দাও, সেখানকার জল হাওয়ায় অসুখ সেরে যেতে পারে।

ঠাকুরদাস তখন ছেলেকে দেশে পাঠিয়ে দিলেন। সত্যি সেখানে কিছুদিনের মধ্যেই রোগ সেরে গেল।

সুস্থ হয়ে ঈশ্বরচন্দ্র আবার ফিরে এলেন কলকাতায়।

কলকাতায় ফিরে আসার পর দীনবন্ধু বললো—দাদা, তোমাকে কিছুদিন রান্না করতে হবে না। আমাকে একটু দেখিয়ে দিও, আমিই রান্না করবো।

তখন কয়েকদিন তাই চলতে লাগলো। ঈশ্বরচন্দ্র দেখিয়ে দিতেন, আর দীনবন্ধু রান্না করতো। যেটা না পারতো, সেটা ঈশ্বরচন্দ্র করে দিতেন। তবে বাজার ঈশ্বরচন্দ্র নিজেই করতেন।

একদিন দীনবন্ধু বললো—দাদা, আমি বাজার করবো। তোমার বেশী হাঁটাহাঁটি করা ভাল হবে না।

তখন তিনি মাঝে মাঝে দীনবন্ধুকে বাজার করতে দিতেন। কিন্তু কি ভাবে কি কিনতে হবে সব কিছু বলে দিতেন ভাইকে।

জোড়াসাঁকোর নতুন বাজার খুব বেশী দূরে নয়। সে অঞ্চলের লোকেরা সেখানেই বাজার করতো। কিন্তু একদিন সন্ধ্যাবেলা দীনবন্ধু সেই যে বাজার করতে গেল, তার ফেরার নাম নেই। রাত এগারোটা বেজে গেল। ঠাকুরদাস বাসায় ফিরে ঈশ্বরচন্দ্রকে বকুনি দিতে লাগলেন। বললেন—নিজে ঘরে আরাম করে কেন ওকে বাজারে পাঠালি? কলকাতার রাস্তায় কখন কি বিপদ হয় বলা যায়?

ঈশ্বরচন্দ্র ভাইয়ের বিপদের আশঙ্কা করে কাঁদতে লাগলেন।



জননী—ভগবতী দেবী

আশেপাশের লোকেরা বললো—কাঁদলে কি হবে? বাজারে গিয়ে ভাইকে খুঁজে দেখো।

ঈশ্বরচন্দ্র তখন বেরিয়ে পড়লেন। প্রথমে গেলেন বড়বাজার কাশীনাথ-বাবুর বাজারে। কিন্তু সেখানে তাকে পাওয়া গেল না। তারপর গেলেন জোড়াসাঁকোর নতুন বাজারে। এদিক ওদিক খুঁজতে গিয়ে দেখতে পেলেন দীনবন্ধু বাজারের এক দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে আছে। ডাকলেন—ওঠ্—ওঠ্—

ভাই ধড়মড় করে জেগে উঠলো। ঈশ্বরচন্দ্র বললেন—কিরে, তুই বাজার নিয়ে এখানে ঘুমিয়ে আছিস?

দীনবন্ধু ভারী লজ্জা পেল। তাড়াতাড়ি উঠে দাদার সঙ্গে বাসায় চলে এলো।

কলেজের নিয়ম হলো অলংকার, ন্যায় ও বেদান্ত পাঠ করে তারপর স্মৃতিশাস্ত্র পর্যন্ত অধ্যয়ন করতে হয়। ছাত্ররা কেউ কেউ প্রথমে ন্যায়শাস্ত্রের শ্রেণীতেও ভরতি হয়ে পড়াশোনা করতো, তারপর পড়তো বেদান্ত শ্রেণীতে। এরপর স্মৃতির শ্রেণীতে মনুসংহিতা, মিতাক্ষরা, জীমূতবাহন কৃত দায়ভাগ প্রভৃতি অধ্যয়ন করে জজ-পণ্ডিতের পদ লাভের জন্য ল-কমিটির পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হতো।

ঈশ্বরচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়ের কাছে আবেদন করলেন—তিনি অলংকার-শ্রেণী থেকেই স্মৃতি-শ্রেণীতে ভরতি হবেন। অধ্যক্ষ ঈশ্বরচন্দ্রের আশ্চর্য মেধার কথা স্মরণ করে তাঁকে অনুমতি দিলেন।

এর ফলে ঈশ্বরচন্দ্রের ওপর পড়ার চাপ খুব বেশী পড়লো। খেয়ে-দেয়ে বড় বাজার থেকে পটলডাঙ্গায় কলেজে যাবার সময় ও আসবার সময় পথে পথে অনেক পাঠ তিনি আবৃত্তি করতেন। বাসায় ফিরে একটু বিশ্রাম করেই আবার চলতো পড়াশোনা। রাত্রের খাওয়াদাওয়া সেরে ঘুমুতে ঘুমুতে দশটা বেজে যেত। বালিশে মাথা দিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র শুনতেন আর্মানি গীর্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বাজল।

মাঝখানে মাত্র দু'ঘণ্টা। তারপরেই গীর্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে বাজতো বারোটা। তখনই আবার তাঁকে উঠে বসতে হতো। রাত বারোটা থেকে শুরু করে সমস্ত রাত অবধি চলতো তাঁর স্মৃতিশাস্ত্র-অধ্যয়ন। এ ভাবে ছ'মাস কঠোর পরিশ্রম করে ঈশ্বরচন্দ্র ল-কমিটির পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলেন।

আশ্চর্যের কথাই বটে! যেখানে দু'তিন বছর লাগে স্মৃতির পাঠ শেষ করতে, সেখানে মাত্র ছ'মাসের মধ্যেই তিনি শেষ করে ফেললেন। এমন একনিষ্ঠ সাধনায় সিদ্ধিলাভ কি না ঘটে পারে? সসম্মানে তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন।

তখনো ঈশ্বরচন্দ্রের মুখে গোঁফের রেখা পড়ে নি, বয়স মাত্র সতেরো কি

আঠারো। সেই সময়ে পেলেন তিনি ল-কমিটির সার্টিফিকেট। এর আগে এত কম বয়সে কেউ এই গৌরব অর্জন করতে পারে নি।

সেই সময়ে ত্রিপুরা জেলার জজপণ্ডিতের পদ শূন্য হলো।

ঈশ্বরচন্দ্র এক আবেদন করে পাঠালেন। মনে মনে ভাবলেন, এত কম বয়সে কি এই ধরনের চাকরি কখনো হতে পারে?

কিন্তু কিছুদিন পরেই এক সরকারী চিঠি এসে হাজির হলো। তাতে লেখা, সত্বর ত্রিপুরায় এসে কাজে যোগদান করো।

ঈশ্বরচন্দ্রের বুক আনন্দে নেচে উঠলো।

ঠাকুরদাস কিন্তু খুব খুশী হলেন না। ছেলের বয়স অল্প, তার ওপর এতদূরে যাবে চাকরি করতে। তাই বললেন—তোমার চাকরির খবর পেয়ে খুবই খুশী হলাম, কিন্তু তোমাকে এই বয়সে এতদূরে পাঠাতে আমি রাজী নই।

ঈশ্বরচন্দ্রের মন খারাপ হয়ে গেল। ঠাকুরদাস তা বুঝতে পেরে বললেন —ঈশ্বর, বিদ্যায় কৃতিত্ব দেখাতে পারলে জীবনে চাকরির তোমার অভাব হবে না। আরো ভাল চাকরি তুমি পাবে।

ঈশ্বরচন্দ্রের মন শান্ত হলো।

এখন বাকী রইলো বেদান্ত, ন্যায় আর দর্শন।

সময় নষ্ট না করে বেদান্তের শ্রেণীতে ভরতি হয়ে গেলেন ঈশ্বরচন্দ্র। অধ্যাপক শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি বেদান্তশাস্ত্রের বিরাট পণ্ডিত। তিনিও ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতিভা দেখে মুগ্ধ হয়ে একদিন বললেন—তুমি সত্যি ঈশ্বর।

দেখতে দেখতে বার্ষিক পরীক্ষার দিন ঘনিয়ে এলো। বার্ষিক পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীদের সংস্কৃত গদ্য ও পদ্য রচনা করতে হতো। সর্বোৎকৃষ্ট রচনার জন্য পুরস্কার ছিল একশো টাকা।

পরীক্ষার দিন যথাসময়ে সব ছাত্ররা এসে উপস্থিত হলো। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের দেখা নেই। অধ্যাপকরা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। কোথায় গেল ঈশ্বর? অনেক খুঁজতে খুঁজতে তাঁকে এক জায়গায় পাওয়া গেল। অধ্যাপক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ বললেন—একি, তুমি পরীক্ষা দিচ্ছ না কেন?

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন—আমি এ পরীক্ষার অনুপযুক্ত, আমাকে অব্যাহতি দিন।

অধ্যাপক বললেন—সে কি, তুমি কলেজের সবচেয়ে ভাল ছাত্র, তুমি পরীক্ষা না দিলে মার্শেল সাহেব রাগ করবেন যে।

—কিন্তু আমি যে ভাল লিখতে পারবো না।

—যা পার তাই লেখ।

তখন পরীক্ষা শুরুর ঘণ্টা পড়ে গেছে। তর্কবাগীশ মার্শাল সাহেবকে বলে ঈশ্বরচন্দ্রকে পরীক্ষার হলে ঢুকিয়ে দিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র পরীক্ষা দিতে বসে হতভম্ব হয়ে বললেন—কি লিখবো?

অধ্যাপক বললেন—লেখ, সত্যং হি..., আর কিছু না বলে চলে গেলেন

সেখান থেকে। ঈশ্বরচন্দ্র লিখতে লাগলেন। রচনার বিষয়বস্তু ছিল সত্যবাদিতার মহিমা।

ঈশ্বরচন্দ্র কি যেন এক প্রেরণা পেলেন মনের মধ্যে। লিখতে শুরু করলেন 'সত্যং হি' বলে। সুন্দর রচনাভঙ্গীর মধ্য দিয়ে সত্যবাদিতার মহিমা ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠলো। একটার সময় গদ্য-রচনা লেখা শেষ হলো। এরপর হাত দিলেন পদ্য-রচনায়। লেখা এগিয়ে চললো অবিরাম গতিতে।

সমস্ত অধ্যাপকের বিবেচনায় ঈশ্বরচন্দ্রের দুটি রচনাই শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণিত হলো। সকলেই একবাক্যে তাঁর রচনার প্রশংসা করলেন।

একশো টাকা করে দুটি বিষয়ে দুশো টাকা পুরস্কার পেলেন ঈশ্বরচন্দ্র।

সেই টাকা বাবার হাতে দিয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। আনন্দে ও গর্বে ঠাকুরদাসের বুক ভরে উঠলো।

একদিকে আনন্দ অন্যদিকে বিষাদ!

জগৎদুর্লভ বাবুর বাড়িতে তাঁদের যে নিরাপদ আশ্রয় ছিল—তাও ছাড়তে হলো একদিন। কি এক চোরা কোম্পানির কাগজ কেনার দায়ে জগৎদুর্লভ গ্রেফতার হলেন। তাঁর কারাদণ্ড হলো।

ঈশ্বরচন্দ্র ভাইকে নিয়ে চলে গেলেন পাতুল গ্রামে। সেখানে দুমাস রইলেন।

মিথ্যা মামলায় জগৎদুর্লভ অভিযুক্ত হয়েছিলেন। কিছুদিন পর তিনি অবশ্য ছাড়া পেলেন। কিন্তু তাঁর ব্যবসায়ে ভয়ানক ক্ষতি হলো। সেজন্য বাড়ির যে অংশে ঠাকুরদাস তাঁর ছেলেদের নিয়ে থাকতেন সে অংশ ভনসুকদাস নামে এক হিন্দুস্থানীকে ভাড়া দিলেন। সেই ভাড়ার টাকাই তাঁর সংসারের একটি আয়ের পথ হয়ে দাঁড়ালো।

ঠাকুরদাস একদিন দেখা করলেন জগৎদুর্লভের সঙ্গে। জগৎদুর্লভ বললেন—সবই তো বুঝতে পারছেন। তবে নীচের ঐ কোণে যে একটি ঘর রয়েছে তাতে যদি থাকেন তো থাকতে পারেন। সেজন্য ভাড়া কিছু দিতে হবে না।

ঠাকুরদাস সেখানে থাকতেই রাজী হলেন। না থেকেই বা উপায় কি? কি স্যাঁতসেঁতে ঘর! সূর্যের আলো ঢোকে না।

কিছুদিন ঐ ঘরে থেকে সকলেরই স্বাস্থ্য খারাপ হতে লাগলো। ঈশ্বরচন্দ্র অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁকে ডাক্তার দেখাতে হলো। ডাক্তার ঘরটি দেখে বললেন—শীগ্‌গির আপনারা এ ঘর ছাড়ুন। নইলে সবাই মারা পড়বেন।

ঠাকুরদাস তখন ঘর খুঁজতে বের হলেন। কম টাকায় একটু ভাল ঘর কোথায় পাওয়া যায়? অনেক ঘুরে ঘুরে শেষে বউবাজার অঞ্চলে একটি ঘর পেলেন। পঞ্চাননতলা আনন্দচন্দ্র সেনের বাড়ি। সেটিই হলো তাঁদের নূতন বাসস্থান।

সাত

বেদান্তের অধ্যাপক শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি বৃদ্ধ হয়েছেন। ঈশ্বরচন্দ্রকে তিনি পুত্রের মত স্নেহ করেন। ঈশ্বরচন্দ্রও তাঁকে ভক্তি করেন পিতার মত।

শম্ভুচন্দ্র বয়সের ভারে জরাজীর্ণ—ভালরূপ চলাফেরা করতে পারেন না। স্নান, আহার প্রভৃতি সব কাজের জন্যই অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিনা দ্বিধায় অনেক কাজেই তাঁর প্রিয় অধ্যাপককে সাহায্য করেন। শম্ভুচন্দ্রও অনেকের কাছেই কথায় কথায় বলেন—ঈশ্বর আমার ছাত্র নয়, পুত্র।

কোন কাজেই ঈশ্বরচন্দ্রের আলস্য নেই। শম্ভুচন্দ্র যখন ডাকেন তখনই ছুটে যান। যে কাজ দরকার হয়, করে দেন, অসুস্থতায় ও রোগে করেন সেবা-যত্ন।

শম্ভুচন্দ্র একদিন বললেন—দেখো ঈশ্বর, বড় কষ্ট পাচ্ছি। স্ত্রী বেঁচে থাকলে আজ আমার এই কষ্ট হতো না।

ঈশ্বরচন্দ্র করুণ সহানুভূতির দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন বৃদ্ধ অসহায় অধ্যাপকের দিকে।

শম্ভুচন্দ্র বললেন—সবাই আমাকে বলছে আবার বিয়ে করবার জন্য। ঘরে স্ত্রী থাকলে আমার এই কষ্টের লাঘব হবে।

বৃদ্ধ অধ্যাপকের কথা শুনে ঈশ্বরচন্দ্র চমকে উঠলেন। নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না। কি বলছেন এই বৃদ্ধ স্থবির পণ্ডিত!

বাংলার অধঃপতিত সমাজের এক করুণ ছবি ঈশ্বরচন্দ্রের চোখের ওপর ফুটে উঠলো। যে মানুষের জীবনের আয়ু শেষ হয়ে আসছে—মৃত্যুর খতিয়ান নিয়ে চিত্রগুপ্ত অপেক্ষা করছে যাঁর দ্বারে—নূতন করে সংসার পাতবার তাঁর এত আগ্রহ!

আশ্চর্য! পরিণাম চিন্তা করছেন না শাস্ত্রে ও বিদ্যায় অভিজ্ঞ প্রবীণ পণ্ডিত। যে নারীকে ঘরে তুলে আনবেন তাঁর মৃত্যুর পর সেই অভাগিনীর কি হবে?

সেই কথা চিন্তা করে শিউরে উঠল ঈশ্বরচন্দ্রের সমস্ত শরীর। তিনি বলে উঠলেন—এই চিন্তা আপনি মনের মধ্যে আনবেন না।

বৃদ্ধ অধ্যাপক একটু বিব্রত হয়েই বললেন—কিন্তু এই বৃদ্ধ বয়সে আমাকে দেখবে কে?

—কেন, আমরা তো আছি।

—কিন্তু তোমরা তো সব সময় আমার কাছে থাকতে পারবে না।

ঈশ্বরচন্দ্রের মুখ দিয়ে এবার অপ্রিয় সত্য কথা বেরিয়ে এল—আপনিও তো চিরকাল থাকবেন না।

বৃদ্ধ অধ্যাপক এবার আরও বিব্রত। বললেন—তোমাকে আমি বোঝাতে পারবো না। কিন্তু অনেকেই এ ব্যাপারে আমাকে উৎসাহ দিচ্ছে।

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন—তারা আপনাকে কুপরামর্শ দিয়েছে। তারা আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী নয়।

কিন্তু প্রবীণ অধ্যাপক কিছুতেই ছাত্রের যুক্তি মেনে নিতে রাজী হলেন না। বরং রেগে গেলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র ভেবেছিলেন বাচস্পতি মহাশয় তাঁর সংকল্প ত্যাগ করবেন। কিন্তু যেদিন শুনলেন বারাসতের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যাকে তিনি বিয়ে করেছেন সেদিন তাঁর মন বিরূপ হয়ে উঠলো অধ্যাপকের ওপর। ঈশ্বরচন্দ্র জানতে পারলেন, কন্যাটি সুন্দরী এবং বয়স খুবই অল্প, অধ্যাপকের নাতনীর বয়সী —তখন তাঁর দুঃখ ও ক্ষোভের অন্ত রইলো না।

ছাতুবাবু ও লাটুবাবু কলকাতার নামজাদা বড়লোক। শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি তাঁদের সভাপণ্ডিত। বাচস্পতি মহাশয়ের ইচ্ছার কথা জানতে পেরে তাঁরাই এ ব্যাপারে উদ্যোগী হলেন। কাজেই কন্যা যোগাড় করতে খুব অসুবিধা হলো না। অর্থের লোভে দরিদ্র পিতা কন্যাকে বৃদ্ধের সঙ্গে বিয়ে দিলেন।

দারিদ্র্যের জ্বালায় যূপকাষ্ঠে বলি দিলেন মেয়েকে।

ঈশ্বরচন্দ্র ভাবতে লাগলেন, হায়, সমাজের লোকেরা কি অন্ধ। এক শ্রেণীর লোক দেশের সর্বনাশ ডেকে আনছে আর এক শ্রেণীর লোক তা নীরবে সহ্য করছে। কেউ কোন প্রতিবাদ করছে না। সবাই নিজের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত।

একদিন কলেজে গিয়েছেন ঈশ্বরচন্দ্র। শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি তাঁকে ডেকে পাঠালেন। নিভৃতে ডেকে নিয়ে বললেন, ঈশ্বর তোমার মা-কে তো একদিন দেখতে গেলে না।

সে কথা শুনে ঈশ্বরচন্দ্রের দু' চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। নীরবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন, কোন কথা বললেন না। মুখ নীচু করেই চলে গেলেন।

কিন্তু বাচস্পতি মহাশয়ের একান্ত আগ্রহে ঈশ্বরচন্দ্রকে একদিন যেতেই হলো। যাবার সময় কলেজের দারোয়ানের কাছ থেকে দুটো টাকা চেয়ে নিলেন।

ঘোমটায় মুখ ঢাকা বালিকা-বধূ। ঈশ্বরচন্দ্র স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন

তার সামনে। তারপর প্রণাম করে কিশোরী বধূর পায়ের কাছে টাকা দু'টি রেখে চলে যাবার জন্য পা বাড়ালেন।

বাচস্পতি তা দেখে বললেন—একি ঈশ্বর, তুমি চলে যাচ্ছ যে। তোমার মাকে দেখে যাও।

ঈশ্বরচন্দ্র থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। একটি মেয়ে এসে নববধূর ঘোমটা খুলে দিল। লজ্জায় অবনত নববধূর মুখ। বিষাদের ভারে সুন্দর মুখখানিও মলিন।

তা দেখে ঈশ্বরচন্দ্রের চোখের জল আর বাধা মানলো না। ঝরঝর করে অবিরল ধারায় ঝরে পড়তে লাগলো।

শম্ভুচন্দ্র হকচকিয়ে গেলেন। এমন ভাবে ছাত্রের কান্নার কোন কারণ তিনি বুঝতে পারলেন না। ঈশ্বরচন্দ্রের হাত ধরে বললেন—ওরে, অকল্যাণ করিস নে।

ঈশ্বরচন্দ্রকে নিয়ে বাইরের ঘরে চলে এলেন শম্ভুচন্দ্র। প্রিয় ছাত্রের মনে সান্ত্বনা দেবার জন্য শাস্ত্রের নানা যুক্তির অবতারণা করলেন। কত রকম কথা বললেন। কিন্তু কোন কিছুতেই ঈশ্বরচন্দ্রের মন শান্ত হলো না। নববধূর কপালের সিন্দূরবিন্দু যেন তাঁর চোখের ওপর স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠে মনে এক অশুভ সংকেত জানাতে লাগলো।

ক'দিন আর তরুণী বধূ তার কপালে ধারণ করতে পারবে ঐ সিন্দূরবিন্দু? ক'দিন!......তারপর?

ব্যথায় মুচড়ে উঠতে লাগলো ঈশ্বরচন্দ্রের কোমল বুক।

অন্দরমহল থেকে জলখাবার এলো। থালাতে সাজানো নানারকম মিষ্টান্ন। শম্ভুচন্দ্র বললেন—একটু মিষ্টিমুখ করতে হয় বাবা, নাও, মুখে তোল।

ঈশ্বরচন্দ্র সেদিকে একটু তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিলেন। বলে উঠলেন—না, আপনার ঘরে আমি আর জলস্পর্শও করবো না।

ঈশ্বরচন্দ্র এক প্রকার ছুটেই ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন।

আট

ঠাকুরদাস মেজো ছেলে দীনবন্ধুর বিয়ে দিলেন। তাতে বেশ কিছু টাকা খরচ হলো। তা ছাড়াও নানা কারণে দেনা হয়ে গেল অনেকগুলো টাকা। ঠাকুরদাস বললেন—আগের মত খরচ করলে আর চলবে না। খরচ কমাতে হবে।

কলকাতার সংসারে খরচ একেই খুব বেশী ছিল না, তার ওপর আরো কমালে থাকবে কি? কিন্তু না কমিয়েই বা উপায় কি আছে?

দুধ মাছ কিছুদিনের জন্য বাদ দেওয়া হলো। বিকেলের জলখাবার ছিল আধ পয়সার ছোলা, আর আধ পয়সার বাতাসা। ঐ ছোলা ভিজিয়ে বাতাসা দিয়ে সবাই খেতো। তার থেকে আবার কিছু ছোলা রেখে দেওয়া হতো রাত্রিবেলার কুমড়োর তরকারিতে দেওয়ার জন্য।

তরকারি এক এক জনের ভাগে যা জুটতো তাও খুব সামান্য। ভাই দু'টির পাতে সেই তরকারি তুলে দিতে গিয়েও ঈশ্বরচন্দ্রের চোখ ছলছল করে উঠতো।

অনেক কষ্টই ঈশ্বরচন্দ্র ছোটবেলায় পেয়েছেন। থাকার কষ্ট, খাওয়ার কষ্ট। কিন্তু কোন কষ্টকেই তিনি কষ্ট বলে মনে করেন নি। বরং ভবিষ্যতের আশায় তাঁর মনে উৎসাহের সঞ্চার হতো। কেমন করে দুঃখের অবসান ঘটবে সেই চিন্তা করতেন। আশায় বুক বাঁধতেন।

এই হলো ঈশ্বরচন্দ্রের জীবন। আশা ও উদ্দীপনার জীবন।

বেদান্ত পড়া শেষ করে ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায় ও দর্শন পড়তে শুরু করলেন।

নিমচাঁদ শিরোমণি তখন ন্যায়দর্শনের অধ্যাপক। অভিজ্ঞ, প্রবীণ ও পণ্ডিত ব্যক্তি।

ঈশ্বরচন্দ্র তখন সংস্কৃত কলেজের বিখ্যাত ছাত্র। ছাত্র ও অধ্যাপকদের কাছে তিনি এক দৃষ্টান্ত। অন্যান্য অধ্যাপকের মত শিরোমণির দৃষ্টিও ঈশ্বরচন্দ্রের ওপর পড়লো, তিনি যত্ন সহকারে তাঁর প্রিয় ছাত্রকে শিক্ষা দিতে লাগলেন।

কিন্তু সহসা নিমচাঁদ শিরোমণির মৃত্যু হলো। তখন কলেজ পরিচালকদের কাছে এক প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো কাকে এই শূন্য পদে নিয়োগ করা যায়। তখন ছাত্রদের পক্ষ থেকে ঈশ্বরচন্দ্র অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেবের কাছে গিয়ে জানালেন—এই পদের জন্য জয়নারায়ণ তর্করত্নই যোগ্য অধ্যাপক, তাঁকেই নিয়োগ করা হোক।

ছাত্রদের প্রস্তাবই ইংরেজ অধ্যক্ষ মেনে নিলেন। জয়নারায়ণ তর্করত্নকেই ন্যায়দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত করা হলো।

এর কিছুকাল পরেই দু' মাসের জন্য ব্যাকরণের দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপকের পদ শূন্য হলো। অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেব এ ব্যাপারে অন্যান্য অধ্যাপকের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। সকলেই পরামর্শ দিলেন, নূতন কোন অধ্যাপক এজন্য নিয়োগ করার প্রয়োজন নেই। ঈশ্বরচন্দ্রকে ঐ দুটি মাস অধ্যাপনার কাজ চালিয়ে নিয়ে যেতে বলা হোক।

মার্শেল সাহেবের কথাটি মনঃপূত হলো। তিনি ঐ তরুণ প্রতিভাবান্ ছাত্রটিকে প্রীতির চোখে দেখতেন। নিজে তিনি ডেকে ঈশ্বরচন্দ্রকে কথাটি বললেন। ঈশ্বরচন্দ্র আপত্তি করলেন না।

তখনও তিনি ছাত্র, অথচ দু' মাসের জন্য অধ্যাপনার কাজে নিয়োজিত হলেন। একটি ছাত্রের পক্ষে এই গৌরব অর্জন সত্যি দুর্লভ।

ছাত্র-হিসাবে ঈশ্বরচন্দ্রের কৃতিত্ব ছিল, কিন্তু অধ্যাপনার ব্যাপারেও তাঁর যে দক্ষতা আছে, তারও প্রমাণ হয়ে গেল। অধ্যাপক ও ছাত্র সকলেই বিস্মিত—স্তম্ভিত।

দু' মাস অধ্যাপনা করে ঈশ্বরচন্দ্র মাইনে পেলেন আশি টাকা। সেই টাকা বাবার হাতে তুলে দিয়ে বললেন—বাবা, এই টাকা দিয়ে আপনি তীর্থ করে আসুন।

ঠাকুরদাস ছেলের এই কথা শুনে আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন। অনেককাল ধরে মনে মনে তিনি ঐরূপ একটি আশা পোষণ করছিলেন। পিতা পরলোকগমন করেছেন অনেকদিন। অথচ তাঁর পিণ্ডদান-ক্রিয়া সম্পন্ন হয় নি। এবার তাঁর সেই আশা সফল হতে চললো।

ঠাকুরদাস শুভদিন দেখে গয়া অভিমুখে যাত্রা করলেন। গয়াতে পরলোকগত পিতৃপুরুষদের পিণ্ড দান করে এবং আরও কয়েকটি তীর্থ পর্যটন করে কিছুদিন পর ফিরে এলেন কলকাতায়।

এদিকে ন্যায়দর্শনের দ্বিতীয় বৎসরের পরীক্ষা শেষ হলো। ঈশ্বরচন্দ্র প্রথম স্থান অধিকার করলেন। সেজন্য পেলেন একশো টাকা পুরস্কার। সংস্কৃত ভাষায় শ্রেষ্ঠ কবিতা রচনার জন্যও একশো টাকা পেলেন। তা ছাড়াও পেলেন আরো দুটি পুরস্কার। আইন পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য পঁচিশ টাকা আর ভালো হাতের লেখার জন্য পেলেন আট টাকা পুরস্কার। সব টাকাই ঈশ্বরচন্দ্র পিতার হাতে তুলে দিলেন।

ঠাকুরদাস অনেক টাকা ঋণী হয়ে পড়েছিলেন। এই টাকা পেয়ে কিছু কিছু ঋণ এবার শোধ করলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র ছাত্র ও অধ্যাপকদের গৌরব—গ্রামবাসীরও গৌরব। যখন তিনি

গ্রামে যেতেন তখন গ্রামের পণ্ডিত ও বৃদ্ধ ব্যক্তিরা তাঁর কাছে আসতেন, নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন। ন্যায়শাস্ত্র নিয়ে অনেকের সঙ্গে তর্কবিতর্ক হতো। ঈশ্বরচন্দ্রের যুক্তি সকলেই মেনে নিতেন।

একবার কুরাণ গ্রামবাসী দর্শনশাস্ত্রবিদ্ বিখ্যাত পণ্ডিত রামমোহন তর্কসিদ্ধান্তের সঙ্গে ন্যায়শাস্ত্র নিয়ে তাঁর তর্ক-প্রতিযোগিতা হয়। তর্কে তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের পরাজয় ঘটে।

কিন্তু জয়লাভ করেও ঈশ্বরচন্দ্র গর্বে অভিভূত হয়ে পড়েন নি। ঠাকুরদাস সেই খবর পেয়ে তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের পায়ের ধুলো তুলে ঈশ্বরচন্দ্রের মাথায় দিয়েছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বরং পরম গৌরবে ও ভক্তিভরে সেই ধুলো মাথায় নিয়েছিলেন।

দুঃখে যেমন বিচলিত হতেন না, প্রশংসায় তেমনি গর্বিত হতেন না। অতি সরল ও উদার ছিল তাঁর মন।

সেই সময়ে থিয়েটার বা হাফ-আখড়াই ছিল না। তখন ছিল কবি ও কৃষ্ণযাত্রার যুগ। ঈশ্বরচন্দ্রের কবি-গান শোনার খুব শখ ছিল। দেশে গিয়ে যদি শুনতেন কোথাও কবিগান হচ্ছে, তখন তিনি না গিয়ে পারতেন না। তাঁর সঙ্গী হতো ভাই অথবা বন্ধুরা। সারারাত তিনি কবিগানের আসরে কাটিয়ে দিতেন।

পূজার ছুটিতে বাড়িতে গিয়ে বেশ কিছুদিন থাকবার অবসর মিলতো। সেই সময়ে তিনি গাঁয়ে গদাধর পাল, ব্রজমোহন চক্রবর্তী ও ছোট ভাইদের সঙ্গে কপাটি খেলতেন। অন্য কোন খেলার দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল না।

দেখতে দেখতে কেটে গেল বারো বছর।

কলেজের শেষ পরীক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্র সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন। তাঁর ছাত্র-জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটলো। তাঁর বয়স তখন কুড়ি বছর।

এই বয়সেই ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলংকার, স্মৃতি, দর্শন, বেদান্ত—সব বিষয়েই তিনি পারদর্শী হয়ে উঠলেন। হলেন তিনি বিস্ময়কর জ্ঞানের অধিকারী।

এত কম বয়সে, এরূপ প্রতিভা ও জ্ঞানের অধিকারী ঈশ্বরচন্দ্র সকল মানুষের বিস্ময়। সকল বিভাগের অধ্যাপকরাই এক বাক্যে বলতে লাগলেন—এমন মেধাবী ও গুণধর ছাত্র আর কখনো আমাদের চোখে পড়ে নি।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকবৃন্দ এমন একটি ছাত্রকে তাঁদের বিদ্যায়তনে পেয়ে পরম গর্বিত। তাঁরা ঈশ্বরচন্দ্রকে তাঁর প্রতিভার যোগ্য সম্মান দেবার কথা বিবেচনা করতে লাগলেন।

প্রখ্যাত ও বয়োবৃদ্ধ অধ্যাপক শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি মহাশয় বললেন—এমন অসাধারণ শক্তি-সম্পন্ন ছাত্র আমাদের বিদ্যায়তনের গৌরব, আমাদেরও গৌরব।

সেই গৌরবের পাত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে একটি বিশেষ উপাধিতে ভূষিত করা দরকার—যে উপাধি এর আগে কেউ লাভ করে নি।

কি উপাধি দেওয়া যায়? সবাই বাচস্পতি মহাশয়ের পরামর্শ চাইলেন। উপাধি দেওয়ার বিষয়ে কারুর দ্বিমত নেই, বরং সবাই আগ্রহান্বিত।

বাচস্পতি বললেন—জ্ঞানের বারিধি যে বক্ষে ধারণ করেছে—সে বিদ্যাসাগর। ঈশ্বরচন্দ্রকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি দেওয়া হোক।

সবাই এক বাক্যে এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন। বললেন—এই হলো যথাযথ মর্যাদা দান।

তখন ঈশ্বরচন্দ্রকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি দেওয়াই স্থির হলো।

সেদিন এক পরম শুভলগ্ন।

সংস্কৃত কলেজের সমস্ত অধ্যাপক মিলে ঈশ্বরচন্দ্রকে উপাধি দান করলেন। সেই ঐতিহাসিক উপাধিপত্র স্বাক্ষর করলেন সংস্কৃত কলেজের ছ' জন বিখ্যাত অধ্যাপক। তাঁরা হলেন—ব্যাকরণে গঙ্গাধর শর্মা, কাব্যে জয়গোপাল তর্কালংকার, অলংকারে প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ, বেদান্ত ও ধর্মশাস্ত্রে শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি, ন্যায়শাস্ত্রে জয়নারায়ণ তর্কভূষণ এবং জ্যোতিষে যোগধ্যান শর্মা।

—'অস্মাভিঃ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র-বিদ্যাসাগরায় প্রশংসাপত্রং দীয়তে'—

বিখ্যাত দিক্‌পাল পণ্ডিতদের মহামূল্যবান্ স্বাক্ষরমণ্ডিত উপাধিপত্র ধারণ করে ঈশ্বরচন্দ্র ধন্য হলেন—বিখ্যাত হলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

উপাধি হয়ে দাঁড়ালো সারা বাংলার ও সারা ভারতের এক বিখ্যাত নাম—বিদ্যাসাগর।

নয়

ছাত্রজীবন সমাপ্ত হওয়ার পর ঈশ্বরচন্দ্র পা দিলেন কর্মক্ষেত্রের দুয়ারে। তখন বাংলাদেশের এক যুগসন্ধিক্ষণ।

পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার স্রোত এসেছে। কিন্তু সে স্রোতে ভেসে যায় নি সারা দেশ। বাংলার সমাজ তখন অচলায়তনে আবদ্ধ। সেই অচলায়তনের বন্ধ দুয়ার ভেদ করার পথে ছিল নানা বাধা। উদারচেতা কয়েকজন ইংরেজ ও বাঙ্গালীর চেষ্টায় যে হিন্দু কলেজ গড়ে উঠেছিল তার ভিত্তিও নড়বড়ে হয়ে উঠলো। তখন এগিয়ে এলেন রাজা রামমোহন রায়। তারপর ডেভিড হেয়ারের সহযোগিতায় বাংলাদেশে ইংরেজী শিক্ষার যুগ শুরু হলো।

ঈশ্বরচন্দ্র তখন বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগরই বটে! তবে ইংরেজী শিক্ষায় নয়—সম্পূর্ণ ভারতীয় শিক্ষায়।

নূতন ইংরেজী শিক্ষার স্রোতে যাঁরা গা ভাসিয়ে দিয়েছেন তাঁরা তখন বিদেশী আচার-ব্যবহার আয়ত্ত করার জন্য ব্যস্ত, কিন্তু বিদ্যাসাগর ব্যস্ত প্রাচীন গৌরবময় ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। ইংরেজী শিক্ষা-দুরস্ত যুবকরা বিদেশী পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধানের জন্য ব্যাকুল, আর বিদ্যাসাগর ব্যাকুল দেশীয় পরিচ্ছদের মর্যাদা বজায় রাখার জন্য।

হিন্দু কলেজের ছাত্ররা বিদেশী ভাবধারার প্রবর্তক।

সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা ভারতীয় সংস্কৃতির বাহক।

দু'টি ভিন্ন স্রোতধারা—অথচ এর মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে না পারলে দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হবে—একথা উপলব্ধি করতে পারলেন বিদ্যাসাগর। তাই নিজে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য আগ্রহী হলেন। শুধু ইংরেজী নয়, সেই সঙ্গে হিন্দীও।

কলকাতায় তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইংলণ্ড থেকে যে সব সিভিলিয়ান ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চাকরি নিয়ে এদেশে আসতেন, তাঁদেরকে এই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা, হিন্দী, উর্দু ও ফারসী শিখতে হতো। এই চারটি ভাষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে তাঁরা চাকরিতে নিযুক্ত হতেন।

মধুসূদন তর্কালংকার ছিলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের সেরেস্তাদার বা হেড পণ্ডিত। তিনি বৃদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যু হলে ঐ পদটি শূন্য হলো।

কলেজের সেক্রেটারী তখন মার্শাল সাহেব। তিনি ঐ পদের জন্য একজন যোগ্য লোকের অনুসন্ধান করতে লাগলেন।

মার্শাল সাহেব যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন তখনই তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে সুদৃষ্টিতে দেখতেন। তাঁর খুব উচ্চ ধারণা ছিল এই প্রিয় ছাত্রটির ওপর। দু' মাসের জন্য সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের অধ্যাপক নিযুক্ত করে ঈশ্বরচন্দ্রের অধ্যাপনার ক্ষমতার পরিচয় পেয়েছিলেন। তাঁর প্রতিভা ও বিদ্যাবত্তার পরিচয় কারুরই অজানা ছিল না। তাই তিনি ঈশ্বরচন্দ্রের খোঁজ করতে লাগলেন। ভাবলেন—ঐ শূন্য পদে ঈশ্বরচন্দ্রই যোগ্যতম ব্যক্তি।

কিন্তু কোথায় ঈশ্বরচন্দ্র? অধ্যয়নের কঠোর সাধনার পর তিনি তখন বীরসিংহ গ্রামে বিশ্রাম করছেন।

মার্শাল সাহেব একদিন এসে উপস্থিত হলেন সংস্কৃত কলেজে। জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের কাছে ঈশ্বরচন্দ্রের কথা জিজ্ঞেস করলেন। জয়নারায়ণ বললেন—ঈশ্বরচন্দ্র তো এখন কলকাতায় নেই। তবে তার বাবা এখন আছেন কলকাতাতেই। দরকার হলে তাঁকে খবর দিতে পারি।

মার্শাল সাহেব জয়নারায়ণকে সব কথা খুলে বললেন। তা শুনে প্রবীণ অধ্যাপকের কি আনন্দ। তিনি বললেন—ঈশ্বরচন্দ্র এমন একটি গৌরবময় পদ লাভ করবে তাতে আমাদেরও গৌরব। আমি আজই তার বাবাকে খবর দিচ্ছি।

জয়নারায়ণ সেদিনই কলকাতার বাসায় গিয়ে ঠাকুরদাসকে শুভ খবরটি জানালেন। ঈশ্বরচন্দ্র ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেডপণ্ডিত হবে এই কল্পনা তাঁর মনেও ছিল না। তিনি আনন্দে অভিভূত হয়ে ছুটলেন গ্রামের বাড়িতে ছেলেকে খবর দিতে।

বিদ্যাসাগরও এই গৌরবজনক পদ প্রাপ্তির সংবাদ পেয়ে খুব খুশী হলেন। তিনি দেরি না করেই চলে এলেন কলকাতায়।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হলেন বিদ্যাসাগর। সেটা ইংরেজী ১৮৪১ সালের শেষের দিক।

বিলেত থেকে আগত সিভিলিয়ানদের পরীক্ষা নেওয়ার ভার পড়তো বিদ্যাসাগরের ওপর। কিন্তু যে ভাবে তিনি সিভিলিয়ানদের পরীক্ষা করতেন তাতে অনেকেই পাস করতে পারতেন না। তার ফলে তাঁদের চাকরি হতো না, হয়তো অনেককে দেশেও ফিরে যেতে হতো।

মার্শাল সাহেব একদিন বিদ্যাসাগরকে বললেন—পণ্ডিত, পরীক্ষায় আঁটা-আঁটিটা একটু কম করলে ভাল হয়।

একুশ বছরের যুবক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সাহেবের মুখের ওপর জবাব দিলেন—ওটি আমাকে দিয়ে হবে না। না হয় চাকরি ছেড়ে দেবো, কিন্তু অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতে পারবো না।

বিদ্যাসাগরের সেই নির্ভীক জবাবে মার্শাল সাহেব রাগ করলেন না। বরং খুশীই হলেন। বললেন—তা হলে সিভিলিয়ানদের বাংলা ভাষার পরীক্ষাটা একটু হালকা করলে ক্ষতি কি?

বিদ্যাসাগর বললেন—আচ্ছা, সেটা বরং ভেবে দেখতে পারি।

চাকরির মায়া বিদ্যাসাগরের ছিল না। নিজের ন্যায়বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে চাকরি বজায় রাখার মানুষ তিনি ছিলেন না। নিজের মতটাকেই সব সময়ে বড় মনে করতেন।

মাস শেষ হয়ে গেল। বিদ্যাসাগর মাইনে পেলেন পঞ্চাশ টাকা।

প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে তাঁর মনে কি আনন্দ! তিনি সেই টাকা বাবার হাতে দিয়ে বললেন—বাবা, আপনি আমাদের জন্য অনেক কষ্ট করেছেন। এখন আমার ইচ্ছে, আপনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে গিয়ে বসুন।

ঠাকুরদাস অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—চাকরি ছেড়ে দেবো কেন? তা হলে সংসার চলবে কি করে?

বিদ্যাসাগর জবাব দিলেন—আর আপনাকে কষ্ট করতে দিতে চাই না। আমি প্রত্যেক মাসে আপনাকে কুড়ি টাকা করে পাঠিয়ে দেবো। তাতে আপনি স্বচ্ছন্দে সংসার চালাতে পারবেন।

ঠাকুরদাসের চাকরি ছাড়ার ইচ্ছা অবশ্য খুব ছিল না। বুঝতে পারছিলেন, শরীর ক্রমশঃ অক্ষম হয়ে আসছে। কিন্তু সংসারের অবস্থার কথা ভেবেই চাকরি করতে বাধ্য হচ্ছিলেন। এবার ঈশ্বরচন্দ্রের ইচ্ছায় চাকরি ছেড়ে দিয়ে দেশে চলে গেলেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকরি নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যাসাগর বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর ইংরেজী শেখা খুবই দরকার। তিনি সিভিলিয়ান সাহেবদের বাংলা পড়ান। তাঁদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে কথা বলতে হলে ভালো ইংরেজী জানা চাই। তা ছাড়াও পশ্চিমের চিন্তাধারার সঙ্গে প্রাচ্যের চিন্তাধারার মিল করতে না পারলে কালোপযোগী শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে না। তাই ইংরেজী শেখার প্রয়োজন তাঁর খুবই জরুরী হয়ে পড়লো।

দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তালতলায় থাকতেন। তিনি ছিলেন হেয়ার স্কুলের শিক্ষক। ভালো ইংরেজী জানতেন। পরে অবশ্য তিনি ডাক্তার হিসাবে খুব নাম করেন। তিনি হলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের পিতা। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর খুব ভাব ছিল। একদিন কথায় কথায় বিদ্যাসাগর তাঁকে বললেন—বাঁড়ুয্যে, আমাকে একটু ইংরেজী শেখাতে পারো?

দুর্গাচরণ অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—চাকরি করছো, আবার ইংরেজী শিখতে চাও কেন?

বিদ্যাসাগর সব কথা বুঝিয়ে বলতেই দুর্গাচরণ রাজী হলেন। তখন বিদ্যাসাগর তাঁর কাছেই ইংরেজী শিখতে লাগলেন। কিন্তু শুধু ইংরেজী শিখলেই হবে না। হিন্দীও শিখতে হবে। তাই বিদ্যাসাগর রাখলেন একজন হিন্দী-শিক্ষক। অবশ্য সেজন্য তাঁকে মাইনে দিতে হতো।

দুর্গাচরণবাবু পরে অবশ্য খুব সময় পেতেন না। তখন তাঁরই ছাত্র

নীলমাধব মুখোপাধ্যায়কে ঠিক করে দিয়েছিলেন। তাঁর কাছেই বিদ্যাসাগর ইংরেজী শিখতেন। তারপর রাজনারায়ণ গুপ্তের কাছেও ইংরেজী শিখেছিলেন। রাজনারায়ণকে মাসে পনেরো টাকা মাইনে দিতে হতো এবং হিন্দীশিক্ষককে দিতে হতো দশটাকা।

এই সময়ে অসম্ভব পরিশ্রম করতে হতো বিদ্যাসাগরকে। সকালে ও সন্ধ্যাবেলায় অনেকেই সংস্কৃত, কাব্য ও ব্যাকরণ পড়তে আসতো তাঁর কাছে। তাদের তিনি নিরাশ করতে পারতেন না। কলেজের চাকরিতে নিয়মিত যেতে হতো। তার ওপর ছিল নিজের ইংরেজী ও হিন্দী শেখা। অথচ কি আশ্চর্য ব্যাপার। এত কাজ করেও অল্পদিনের মধ্যেই বিদ্যাসাগর ইংরেজী ও হিন্দী ভাষা বেশ ভালো ভাবেই শিখে ফেললেন।

এবার বিদ্যাসাগরের অঙ্ক শেখার ঝোঁক হলো। শোভাবাজার রাজবাড়ির রাজা রাধাকান্তের জামাতা অমৃতলাল মিত্র ও শ্রীনাথ ঘোষ আর দৌহিত্র আনন্দকৃষ্ণ বসু এদের সকলের সঙ্গেই তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। তাঁদের কাছেই তিনি অঙ্ক শিখতে যেতেন। কিন্তু বিষয়টি খুব নীরস মনে হওয়ায় আর বেশীদূর অগ্রসর হলেন না!

আনন্দকৃষ্ণ বসু খুব ভাল ইংরেজী জানতেন। সেক্সপীয়র কাব্যের আবৃত্তিও করতে পারতেন খুব চমৎকার। বিদ্যাসাগর তাঁর কাছে সেক্সপীয়র পড়তে লাগলেন।

তখনো বিদ্যাসাগরের সঙ্গে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের পরিচয় ঘটে নি। একদিন দুপুরবেলা বিদ্যাসাগর রাজবাড়িতে গিয়েছেন। রাজা রাধাকান্ত মধ্যাহ্ন ভোজ সমাধা করে উঠেছেন সবে মাত্র। তিনি দেখতে পেলেন একটি তরুণ যুবক সোজা আনন্দকৃষ্ণের ঘরের দিকে যাচ্ছেন। তাঁর চোখে মুখে যেন প্রতিভার জ্যোতি। কাছেই একজন লোক দাঁড়িয়েছিল, তাকে রাধাকান্ত জিজ্ঞেস করলেন—এ যুবকটি কে হে? ওকে ডেকে আনো তো।

লোকটি গিয়ে বিদ্যাসাগরকে সে কথা জানালো। বিদ্যাসাগর চমকে উঠলেন একটু। রাজাবাহাদুর তাঁকে ডাকছেন কেন? যা হোক, তিনি এলেন। সঙ্গে এলেন আনন্দকৃষ্ণ বসু।

আনন্দকৃষ্ণ রাধাকান্ত দেবকে বললেন—আপনি একে চেনেন না বুঝি? এঁর নাম বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগর! হ্যাঁ, বিদ্যাসাগরের নাম তিনি শুনেছেন বটে, কিন্তু চাক্ষুষ তাঁকে দেখেননি। আজ দেখলেন, আলাপ হলো। আলাপ করে বুঝলেন, হ্যাঁ, বিদ্যাসাগরই বটে। পরবর্তী কালের সমাজ-বিপ্লবের প্রতিদ্বন্দ্বী দুই নায়কের এই হলো আলাপের প্রথম সূত্রপাত।

দশ

কর্মজীবনের শুরুতেই বিদ্যাসাগর মনে এক কঠিন আঘাত পেলেন, অধ্যাপক শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতির মৃত্যু হলো। বৃদ্ধের তরুণীবধূর গা থেকে তখনো বিয়ের গন্ধ যায়নি। বালিকার জীবনের সমস্ত আশা ও সুখের স্বপ্ন অকালেই ভেঙে গেল।

তরুণী বধূর বৈধব্য বেশ দেখে বিদ্যাসাগর কেঁদে ফেললেন। ভাবতে লাগলেন, এর পরিণাম কি হবে?

ক্ষয়িষ্ণু বাংলার ভয়াবহ এক করুণ ছবি তাঁর চোখের সামনে ফুটে উঠলো।

বিদ্যাসাগরের সেই চোখের জল কোনদিন শুকায়নি। সেই অশান্ত অশ্রুধারা থেকেই একদিন জন্ম নিয়েছিল বিধবা বিবাহের পরিকল্পনা। শুরু হয়েছিল বাংলার বুকে এক প্রবল আলোড়ন।

বিদ্যাসাগর তাঁর বাবাকে কথা দিয়েছিলেন প্রতি মাসে কুড়ি টাকা করে পাঠাবেন। তাই পাঠাতে লাগলেন।

তাঁর হাতে থাকতো আর ত্রিশ টাকা। সেই ত্রিশ টাকাতেই তিনি কলকাতার বাসার খরচ চালাতেন। বাসায় লোক দু-জন একজন নয়, রীতিমত ন-জন। বিদ্যাসাগরের আরো দুটি ভাই থাকে, আর থাকে কাকার দুই ছেলে, দুটি পিসতুতো ভাই, একটি মাসতুতো ভাই আর তাঁদের বাড়ির পুরনো ভৃত্য শ্রীরাম। এই ন-জন লোকের খরচ চালাতে হয় বিদ্যাসাগরকে।

তাঁরা তখন থাকতেন বৌবাজারে হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে।

বয়সে বিদ্যাসাগর সকলের চেয়ে বড়, আর তাঁর রোজগারেই সংসার চলে। তবু তাঁর মনে কোন বিরক্তি নেই। তিনি পালা করে রান্নাও করেন। নিজের অসংখ্য কাজ থাকা সত্ত্বেও সেই কাজে অবহেলা কোনদিন করেননি।

বিদ্যা দানে কৃপণতা নেই বিদ্যাসাগরের। অনেক লোক আসে তাঁর কাছে কাব্য, ব্যাকরণ ও সংস্কৃত পড়তে। তিনি পালা করে কাউকে সকালে কাউকে সন্ধ্যায় পড়ান।

একদিন এলেন রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাতি। বললেন—আমি সংস্কৃত শিখবো।

আগে সংস্কৃত শিখতে হতো মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়ে। সেভাবে শিখতে অনেক সময় লাগে। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়স একটু বেশী। তাই বিদ্যাসাগরকে বললেন—শেখার তো খুব ইচ্ছা। কিন্তু পারবো কি?

বিদ্যাসাগর বললেন—কেন পারবে না?

রাজকৃষ্ণ বললেন—মুগ্ধবোধ পড়ে সংস্কৃত শিখতে তো দেরি হবে অনেক। অন্য কোন সহজ উপায়ে শেখা যায় না?

বিদ্যাসাগর ভাবতে লাগলেন কি করা যায়। অনেক ভেবে ভেবে এক রাত্রের মধ্যে একখানা সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখে ফেললেন। পরদিন রাজকৃষ্ণ যেতেই বললেন—এই নাও, তোমার সমস্যার সমাধান।

সেই বই দেখে রাজকৃষ্ণ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। কত ক্ষমতা থাকলে এক রাত্রের মধ্যে এমন একটা বই লেখা যায়।

সেই ব্যাকরণের সাহায্যে রাজকৃষ্ণ অতি সহজেই সংস্কৃত শিখতে সক্ষম হলেন।

বিদ্যাসাগর দেখলেন এই উপায়ে সংস্কৃত শেখা সকলের পক্ষেই সহজ হবে। তখন সেই সংস্কৃত ব্যাকরণ থেকেই পরবর্তী কালে তৈরি করলেন উপক্রমণিকা। সংস্কৃত শিক্ষার এক কঠিন বাধা তিনি অপসারিত করলেন।

বিদ্যাসাগরের উৎসাহে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সংস্কৃত কলেজে জুনিয়র পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। কিন্তু কিছুদিন পর বিদ্যাসাগর জানতে পারলেন, এক গরিব ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সেই জুনিয়র বৃত্তি পেয়ে সংস্কৃত কলেজে পড়ছেন। রাজকৃষ্ণ ঐ পরীক্ষায় পাস করলে তাঁর বৃত্তি বন্ধ হয়ে যাবে। গরিব পণ্ডিতের পড়াও আর হবে না। তখন বিদ্যাসাগর রাজকৃষ্ণকে পরীক্ষা দিতে নিষেধ করলেন।

রাজকৃষ্ণের মন তাতে একটু দমে গেল। কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁকে উৎসাহ দিয়ে বললেন—তুমি সিনিয়র পরীক্ষা দাও।

রাজকৃষ্ণ অবাক্ হয়ে বললেন—সে কি, সে যে কঠিন ব্যাপার?

বিদ্যাসাগর বললেন—মোটেই কঠিন নয়, আমি তোমাকে সাহায্য করবো।

বিদ্যাসাগর ভরসা দিয়েছেন, তখন আর ভয় কি! রাজকৃষ্ণ মহা উৎসাহে সিনিয়ার পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন।

মার্শাল সাহেবও বিদ্যাসাগরের কাছে সংস্কৃত পড়তেন। তিনি বেশ ভালো বাংলাও শিখেছিলেন। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তিনি বাংলায় কথাবার্তা বলতেন। তাঁর কাছে অনেক সময়েই বিদ্যাসাগর বাংলায় চিঠি লিখতেন। সেই চিঠি পড়তে মার্শাল সাহেবের কোন অসুবিধা হতো না।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকরি নিয়ে বিদ্যাসাগর শুধু অধ্যাপনার কাজেই



পত্নী—দীনময়ী দেবী

ব্যস্ত রইলেন না। কলেজের যাতে উন্নতি হয় এবং শিক্ষা ব্যবস্থার যাতে উন্নতি ঘটে সেদিকে দৃষ্টি দিলেন।

এদেশে ইংরেজী শিক্ষার তখন আদি পর্ব চলছে। লর্ড অকল্যাণ্ডের নীতি ছিল যে ইওরোপীয় সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের শিক্ষা ইংরেজীতে দেওয়া হবে এবং ইংরেজীর সঙ্গে এ-দেশীয় ভাষার শিক্ষাও চলবে। সেই নীতিতে চলতে চলতে বাংলা দেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রবল স্রোত এলো। আদালত থেকে ফারসী ভাষা উঠে গেল। হলো সেখানে বাংলার প্রচলন।

জেলায় জেলায় ইংরেজী-বাংলা স্কুল স্থাপিত হতে লাগলো। শিক্ষা-বিভাগের সমস্ত দায়িত্ব তখন দেওয়া হলো 'কাউন্সিল অব এডুকেশনের' ওপর।

লর্ড হার্ডিঞ্জ তখন বড়লাট। একদিন তিনি এলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ পরিদর্শন করতে। মার্শাল সাহেবের কাছে তিনি শিক্ষা ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের উৎসাহ ও আগ্রহের অনেক কথাই শুনতে পেলেন। লর্ড হার্ডিঞ্জের মনেও তখন ব্যাপকভাবে শিক্ষা-বিস্তারের একটা পরিকল্পনা ছিল। তাই তিনি সে বিষয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পরামর্শ করলেন।

বিদ্যাসাগর সেই সময়ে বাংলা ভাষার সাহায্যে ইওরোপীয় সমাজরীতি ও ভাবধারা বাংলার সমাজজীবনে প্রচলিত করবার চেষ্টা করছিলেন। তিনি দেখলেন, সংস্কৃত কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্রদের প্রতি গভর্নমেণ্টের কোন দৃষ্টি নেই, সেই সব ছাত্রদের দেশের কোন কাজেও নিযুক্ত করার কোন পথ নেই। একমাত্র জজপণ্ডিতের চাকরি ছিল, তাও কিছুদিন আগে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে সংস্কৃত শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে এক সংকট। সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি লোকের আগ্রহ দিন দিন কমে আসছে।

বিদ্যাসাগর লর্ড হার্ডিঞ্জকে বললেন—সংস্কৃত কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্রদের জন্য কিছু করা দরকার।

লর্ড হার্ডিঞ্জ বিদ্যাসাগরকে জিজ্ঞেস করলেন—আপনি এ বিষয়ে কি ভেবেছেন?

বিদ্যাসাগর তাঁর পরিকল্পনার কথা বড়লাটকে জানালেন। সংস্কৃত কলেজ থেকে এমন ছাত্র তৈরী হবে যারা কেবলমাত্র সংস্কৃতে নয়, সর্ব বিদ্যায় অভিজ্ঞ হবে এবং তাদের মন হবে সংস্কারমুক্ত।

হার্ডিঞ্জ বিদ্যাসাগরের এই পরিকল্পনাকে সমর্থন করলেন।

ছোটলাট হ্যালিডের সঙ্গে বিদ্যাসাগর এ বিষয়ে আগে আলোচনা করে-ছিলেন। তিনিও তাঁর সমর্থন জানিয়েছিলেন।

এবার দুজনের মিলিত সমর্থনে বিদ্যাসাগরের কাজের পথে বাধা দূর হলো। স্থাপিত হলো বাংলা দেশে মডেল বিদ্যালয়। এরপর থেকে লর্ড হার্ডিঞ্জ এবং হ্যালিডে দুজনেই বিদ্যাসাগরকে শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে সর্বপ্রকারে

সাহায্য করতে লাগলেন। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় বিদ্যাসাগর অসীম উৎসাহ নিয়ে বাংলাদেশে শিক্ষাবিস্তারের কাজে এগিয়ে চললেন।

একশো একটি মডেল স্কুল স্থাপিত হলো। ঠিক হলো, সংস্কৃত কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্ররাই এই সব স্কুলে শিক্ষকতা করবে। শিক্ষকদের নির্বাচন ও নিয়োগের ভার দেওয়া হলো মার্শাল সাহেব ও বিদ্যাসাগরের ওপর।

এর ফলে ঈশ্বরচন্দ্রের কাজের বোঝা ভয়ানক ভারী হয়ে উঠলো। তবে শিক্ষা-বিভাগে তাঁর প্রতিপত্তি বেড়ে গেল অনেক।

এই সময়ে সংস্কৃত কলেজের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যাকরণ অধ্যাপকের পদ শূন্য হলো। দ্বিতীয় শ্রেণীর পদে অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপকের আসন শূন্যই রইলো।

শিক্ষা-সমিতির অধ্যক্ষ ডাঃ ময়েট ঐ পদে একজন যোগ্য লোক নিযুক্ত করার জন্য মার্শাল সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। দুজনে পরামর্শ করে স্থির করলেন বিদ্যাসাগরই ঐ পদের উপযুক্ত লোক।

প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপকের বেতন ছিল নব্বই টাকা। বিদ্যাসাগরকে সে কথা জানানো হলো। তখন তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পঞ্চাশ টাকা মাইনে পান। নিঃসন্দেহে প্রস্তাবটি পরম লোভনীয়।

কিন্তু প্রস্তাবটি কানে আসতেই তাঁর মনে পড়ে গেল আর এক বন্ধুর কথা। তাঁর নাম তারানাথ তর্কবাচস্পতি। ব্যাকরণে ও অন্যান্য শাস্ত্রে তাঁর অগাধ জ্ঞান। তিনি বিদ্যাসাগরকে একটি কাজের জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেছিলেন। বিদ্যাসাগরও বলেছিলেন—এবার কোন কাজের সন্ধান পেলে আপনার জন্য চেষ্টা করবো।

সে কথা মনে হতেই বিদ্যাসাগর বললেন—ব্যাকরণে অগাধ পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতিকেই ঐ পদটি দেওয়া হোক।

ময়েট সাহেব অবাক্ হয়ে গেলেন সেই কথা শুনে। জিজ্ঞেস করলেন —সে কি, এতে বেশী মাইনে, অথচ আপনি রাজী হচ্ছেন না কেন?

বিদ্যাসাগর জবাব দিলেন—আমি চাই একজন যোগ্য লোক তাঁর যোগ্য মর্যাদা পাক।

ময়েট সাহেব বললেন—আপনি তো তারানাথ তর্কবাচস্পতিকে ঐ কাজ দিতে বলছেন, কিন্তু তিনি তো এখানে নেই। অথচ আগামী সোমবারের মধ্যে লোক চাই।

যেদিন এই সব কথাবার্তা হচ্ছিল সেদিন ছিল শনিবার।

ময়েট সাহেব বললেন—অন্ততঃ সোমবার বেলা দশটার মধ্যে যাতে তাঁর আবেদন-পত্র এসে পেঁছায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

বিদ্যাসাগর বললেন—বেশ, তাই করবো।

তর্কবাচস্পতি তখন থাকতেন কালনায়। কলকাতা থেকে ষাট মাইল দূর। অথচ যাতায়াতের কোন ভাল ব্যবস্থা নেই।

বিদ্যাসাগর অল্পক্ষণের মধ্যে কর্তব্য স্থির করে ফেললেন। বাড়ি ফিরে খাওয়া-দাওয়া সেরে সেদিন সন্ধ্যাবেলাতেই রওনা হয়ে গেলেন কালনার দিকে।

সারারাত হেঁটে পরদিন দুপুরবেলায় কালনায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। ব্যাপার দেখে বাচস্পতি তো অবাক্। তাঁকে খবর দেবার জন্য বিদ্যাসাগর এসেছেন এত কষ্ট করে পায়ে হেঁটে! কৃতজ্ঞতা জানাবার কোন ভাষা তিনি খুঁজে পেলেন না।

বিদ্যাসাগর বললেন—কাল গিয়ে আপনার কাজে যোগদান করা সম্ভব হবে কি?

তারানাথ বললেন—বিদ্যাসাগরের পক্ষে যা সম্ভব তা কি সকলের পক্ষে সম্ভব হতে পারে? তা ছাড়া দেখছেন তো আমার শরীরের অবস্থা?

বিদ্যাসাগর দেখলেন সত্যি তর্কবাচস্পতির পক্ষে হেঁটে আগামী কালের মধ্যেই কলকাতা যাওয়া সম্ভব নয়। তখন তাঁর হাত দিয়ে একটি আবেদন-পত্র লিখিয়ে নিলেন বিদ্যাসাগর। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আবার হেঁটে কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করলেন। অবিশ্বাস্য—কিন্তু অতি সত্য এ ঘটনা।

সারারাত হেঁটে বিদ্যাসাগর কলকাতায় পেঁছিলেন সোমবার সকালবেলায়। বেলা সাড়ে দশটায় গিয়ে হাজির হলেন ময়েট সাহেবের কাছে। হাতে তাঁর তর্কবাচস্পতির আবেদন-পত্র।

ময়েট সাহেব বিস্মিত হয়ে গেলেন। এমন অসম্ভব ব্যাপার যে ঘটতে পারে তা সাহেবের কল্পনার মধ্যে ছিল না। বিদ্যাসাগরের পরোপকার প্রবৃত্তি এবং মহত্ত্বের পরিচয় পেয়ে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপকের চাকরি হয়ে গেল তর্কবাচস্পতির। অর্থকষ্ট থেকে মুক্তি পেলেন প্রবীণ পণ্ডিত। ঈশ্বরচন্দ্র প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন—পরের উপকারের জন্য নিজের স্বার্থ ত্যাগ করলেন। নিজের অর্থাভাবের কথা—নিজের পদোন্নতির কথা একটুও ভেবে দেখলেন না।

সেজো ভাই শম্ভুচন্দ্রের বিয়ে। মা চিঠি লিখেছেন বীরসিংহ থেকে। বিশেষভাবে লিখেছেন—এই বিয়েতে তোমার আসা চাই।

বিদ্যাসাগর স্থির করলেন বাড়ি যাবেন। মার্শাল সাহেবের কাছে ছুটি চাইলেন। মার্শাল বললেন—পণ্ডিত, এখন যে রকম কাজ পড়েছে, তাতে তোমার কিছুতেই যাওয়া উচিত নয়।

বিদ্যাসাগর বললেন—ভাইয়ের বিয়ে। শুধু দুদিনের জন্য যাবো।

মার্শাল বললেন—এক দিনের জন্যও তোমার যাওয়া উচিত নয়। এই সময়ে তুমি গেলেই কাজে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।

বিদ্যাসাগর বিষণ্ণ মনে বাসায় ফিরে এলেন। বাসা তখন প্রায় খালি। বিয়ে উপলক্ষে ভৃত্য শ্রীরাম ছাড়া সবাই বাড়ি চলে গেছে।

মনটা হুহু করে উঠলো বিদ্যাসাগরের। ভাইয়ের বিয়ে, মা এত করে লিখেছেন অথচ তিনি যেতে পারলেন না। মায়ের একান্ত ইচ্ছা পূরণ করতে পারলেন না চাকরির জন্য। সারারাত চোখে ঘুম এলো না বিদ্যাসাগরের। নানা চিন্তা ও দুঃখে মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো।

ভোরবেলা উঠেই তিনি গিয়ে হাজির হলেন মার্শাল সাহেবের কাছে। অসময়ে বিদ্যাসাগরকে দেখে মার্শাল অবাক্ হয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন —তুমি এই অসময়ে কি মনে করে এলে পণ্ডিত?

বিদ্যাসাগর বললেন—মা আমাকে বাড়ি যেতে বলেছেন, আমাকে যেতেই হবে।

মার্শাল সাহেব বললেন—কিন্তু পণ্ডিত, এই সময়ে কেমন করে ছুটি দেই তোমাকে?

বিদ্যাসাগর বললেন—বেশ, ছুটি দিতে না পারেন, আমি চাকরিতে ইস্তফা দিলাম। মঞ্জুর করুন—আমি বাড়ি যাই।

মার্শাল সাহেব বিদ্যাসাগরের মনের দৃঢ়তা দেখে ও মায়ের ওপর গভীর ভক্তি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। বললেন—পণ্ডিত, তোমাকে চাকরিতে ইস্তফা দিতে হবে না, ছুটি দিলাম, বাড়ি যাও।

শুনে বিদ্যাসাগরের মনে কি আনন্দ! বাসায় ফিরে এসে শ্রীরামকে বললেন—তৈরী হও, বাড়ী যাবো।

শ্রীরাম তো অবাক্। যাওয়া হবে না বলে সে হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে।

বিদ্যাসাগর খাওয়া-দাওয়া সেরে শ্রীরামকে নিয়ে রওনা হয়ে পড়লেন। তখন শ্রাবণ মাস—বর্ষাকাল। বাঁধানো সড়ক পেরিয়ে যাবার পরই শুরু হলো কাদামাখা পথ। অনেক জায়গায় জলও জমে আছে। পথ চলা দায়। বিদ্যাসাগর দেখলেন, শ্রীরামের খুব কষ্ট হচ্ছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, যে কোন সময়ে বৃষ্টি হতে পারে। তাই শ্রীরামকে বললেন—তুমি বৃদ্ধ মানুষ, এই দুর্যোগে যেতে পারবে না। কলকাতায় ফিরে যাও।

বিদ্যাসাগরকে একা ফেলে শ্রীরামের ফিরে যাবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু পথের অবস্থা দেখে অগত্যা ফিরে আসতে হলো। বিদ্যাসাগর একাই অতি কষ্টে পথ হেঁটে পেঁাছলেন দামোদর নদের ধারে। বর্ষায় দামোদরের কি ভয়ংকর রূপ! উত্তাল তরঙ্গ আর প্রবল স্রোত। পার হবার নৌকা এপারে নেই—ওপারে। এপারে আসবে কিনা আরও ঠিক নেই। নৌকা পেলেও সেদিন বাড়িতে পেঁাছানো সম্ভব হবে না। অথচ আজই তাঁর বাড়িতে গিয়ে হাজির হওয়া চাই।

বিদ্যাসাগর তখন নদী সাঁতরেই ওপারে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। পাড়ে

যারা ছিল, তারা তাঁকে নিষেধ করলো—খবরদার, এই রাক্ষুসে দামোদরে সাঁতার দেবেন না।

কিন্তু কে কার কথা শোনে? বীরসিংহের সিংহ ঝাঁপিয়ে পড়লেন দামোদরের বুকে। প্রবল স্রোতের মধ্যেও সাঁতার কেটে গিয়ে পৌঁছলেন অপর পারে।

আবার চলা শুরু হলো। হাঁটতে হাঁটতে পথ আর ফুরায় না। সন্ধ্যা হতে না হতেই আবার সামনে পড়লো আর একটি নদ—দ্বারকেশ্বর। দামোদরের মতই দ্বারকেশ্বরের বর্ষাকালীন রূপ। পারাপার হবার খেয়া নৌকা এখানেও নেই।

সাঁতার কেটে পার হওয়া ছাড়া আর উপায় কি! মনে পড়ে গেল মায়ের মুখ। মা তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করে বসে আছেন।

আবার ঝাঁপিয়ে পড়লেন নদীর জলে। সাঁতার কেটে ওপারে গিয়ে উঠলেন। আবার শুরু হলো পথ চলা। অতি দুর্গম সেই পথ। তার ওপর দস্যুর উৎপাত। কিন্তু মায়ের নামে সব ভয় বিদ্যাসাগরের মন থেকে দূর হয়ে গেল।

হেঁটে হেঁটে যখন বাড়ি গিয়ে পৌঁছলেন তখন গভীর রাত। বর ও বরযাত্রীরা চলে গেছে। সারা বাড়ি নিস্তব্ধ। সবাই ঘুমিয়ে আছে। শুধু জেগে আছেন জননী ভগবতী দেবী। নীরবে চোখের জল ফেলছেন আর ভাবছেন—ঈশ্বরচন্দ্র এলো না।

এমন সময় কার ডাকে চমকে উঠলেন!—মা মা, দরজা খোল, আমি এসেছি।

ঈশ্বর এলি?—ছুটে গিয়ে মা দরজা খুলে দিলেন। দেখলেন ভেজা কাপড়ে দাঁড়িয়ে আছেন ঈশ্বরচন্দ্র।

আনন্দে ও গর্বে অভিভূত হয়ে পড়লেন ভগবতী দেবী। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তখনো বিস্ময়ের ঘোর তাঁর কাটেনি। যেন তিনি স্বপ্নই দেখছেন।

হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠলেন ভগবতী দেবী!

—এত দেরি করে এলি?...একি, তোর জামাকাপড় যে ভেজা। আয়, ঘরে এসে ওসব বদলে নে।

ভেজা জামাকাপড় ছেড়ে বিদ্যাসাগর শুকনো জামাকাপড় পরলেন। অতি যত্ন করে মা ছেলের জন্য খাবার তুলে রেখে দিয়েছিলেন। নিজেও এত রাত অবধি কিছু খাননি। এবার দু জনে খেতে বসলেন।

খাওয়ার পর আরম্ভ হলো ছেলে ও মায়ে নানা সুখ দুঃখের কথা। দুজনের চোখেই আনন্দের অশ্রুধারা উপচে উঠলো।

এগারো

একদিন বিদ্যাসাগর শোভাবাজারে আনন্দকৃষ্ণের কাছে সেক্সপীয়র পড়ছেন, এমন সময় একটি যুবক সেখানে এসে দাঁড়ালেন। কৃশ তনু কিন্তু চোখ মুখে প্রতিভার উজ্জ্বল দীপ্তি।

বিদ্যাসাগর তাকালেন সেই যুবকের দিকে। আনন্দকৃষ্ণ বললেন—এঁকে চেনেন? ইনি অক্ষয় দত্ত, 'তত্ত্ববোধিনীর' সম্পাদক। এঁর লেখাই আপনি সেদিন সংশোধন করে দিয়েছেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তখন যা ছাপা হতো, আনন্দকৃষ্ণ ও আরো কয়েকজন তা সংশোধন করে দিতেন। যদিও অক্ষয়কুমার দত্ত পত্রিকার সম্পাদক, তবু তাঁর একটি অনুবাদ রচনা আনন্দকৃষ্ণ দেখছিলেন। এমন সময় বিদ্যাসাগর সেখানে উপস্থিত হলেন। আনন্দকৃষ্ণ লেখাটি পড়ে শোনালেন তাঁকে। বিদ্যাসাগর বললেন—লেখাটি ভালো হয়েছে। তবে অনুবাদের কয়েকটি জায়গায় ইংরেজী ভাব রয়েছে।

আনন্দকৃষ্ণ বললেন—সংশোধন করে দিন।

বিদ্যাসাগর তাই করে দিলেন।

অক্ষয়কুমারের নাম বিদ্যাসাগর আগেও শুনেছেন, কিন্তু চাক্ষুষ দেখলেন এই প্রথম। অক্ষয়কুমারও বিদ্যাসাগরের নাম শুনেছেন এবং তাঁকে দেখেছেন কয়েকবার, কিন্তু আলাপ হয়নি। এই প্রথম ভাবীকালের দুই যুগ-সারথির সঙ্গে পরিচয় ঘটলো।

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার' দান উপেক্ষা করার নয়। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের সূচনা হয়েছিল। ইতিপূর্বে সমাচার-দর্পণ, সংবাদ-কৌমুদী, সমাচার-চন্দ্রিকা, বঙ্গদূত, সংবাদ-প্রভাকর প্রভৃতি সাময়িক ও সংবাদ-পত্র বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ক্রমবর্তনের পদচিহ্ন রেখে গিয়েছে। সেই পদচিহ্নকে লক্ষ্য করে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এগিয়ে চলেছে তার অভীষ্টসিদ্ধির পথে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর নব-জাগরণের ইতিহাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও তত্ত্ববোধিনী সভা উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষর রেখে গিয়েছে। সেই সময়ে কলকাতায় যে সামাজিক আলোড়ন হয় তার ফলে গড়ে ওঠে নানা সভা সমিতি। সেই সভা সমিতিগুলির মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল তত্ত্ববোধিনী সভা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এর প্রতিষ্ঠাতা।

বাংলার সংস্কৃতির পীঠস্থান জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে তত্ত্ববোধিনী সভা যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী যুবকদের উচ্ছৃঙ্খলতা ও দলে দলে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ তখন দেশের সুধীজনকে চিন্তান্বিত করে তুললো। সেই সময়ে তত্ত্ববোধিনী সভা এক প্রয়োজনীয় ভূমিকা নিয়ে অবতীর্ণ হলো শিক্ষিত সমাজের সামনে। ধর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি নিয়ে সেই সভায় নানা আলোচনা হতো।

ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী অভিজাত সমাজের অধিকাংশই এই সভার সভ্য হতে লাগলেন। সভার মুখপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করে বাংলা সাংবাদিকতা ও সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে এক আলোড়ন নিয়ে এলো।

বিদ্যাসাগর কালক্রমে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এলেন। শোভাবাজার রাজবাড়িতে অক্ষয়কুমার দত্তের সঙ্গে আলাপের সূত্রপাত গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হলো। বিদ্যাসাগর সেই সভার শুধু সভ্য নয়—পরবর্তী কালে সম্পাদক পর্যন্ত নিযুক্ত হলেন।

বিদ্যাসাগর অক্ষয়কুমারের সঙ্গে তত্ত্ববোধিনী সভায় আসেন এবং দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। অক্ষয়কুমারকেও দেবেন্দ্রনাথের কাছে একদিন নিয়ে এসেছিলেন গুপ্ত-কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। এ ভাবেই গড়ে উঠেছিল এক মধু-চক্র।

বিদ্যাসাগর তত্ত্ববোধিনী সভায় যোগদান করেছিলেন ধর্মের আকর্ষণে নয়, সাহিত্যের আকর্ষণে। অক্ষয়কুমারের উৎসাহেই বিদ্যাসাগর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় মহাভারতের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। এর আগে এমন সুন্দর বাংলা অনুবাদ আর হয়নি।

আদি পর্বের কিছু অংশ মাত্র প্রকাশিত হয়েছিল। এমন সময় বিদ্যাসাগর শুনতে পেলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাভারতের অনুবাদ করতে উদ্যোগী হয়েছেন। তখন তিনি লেখা বন্ধ করে দিলেন।

এরপর কি ঘটেছিল বাঙালী পাঠকদের তা অজানা নেই। মহাভারতের বাংলা অনুবাদ করে কালীপ্রসন্ন সিংহ যশস্বী হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর যদি অনুবাদে ক্ষান্ত না হতেন তা হলে এই যশোলাভ হয়তো তাঁর ভাগ্যে ঘটতো না। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহও অকপটে সে কথা স্বীকার করেছেন।

বিদ্যাসাগরের দয়ার তুলনা নেই—মহত্ত্বের তুলনা নেই।

অক্ষয়কুমারের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের নানাদিক দিয়ে মিল ছিল। দুজনেই দরিদ্রের সন্তান। দারিদ্র্যের সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াই করে জীবনের সাধনার পথে

অগ্রসর হয়েছেন। দুজনেই অসামান্য প্রতিভাশালী পুরুষ। জ্ঞানানুশীলন, পরোপকার দুজনেরই জীবনের ব্রত। দুজনে প্রায় একই সময়ে বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষ বিধানে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। পরবর্তী কালেও প্রায় একই সময়ে দুজনে করেছিলেন সমাজসংস্কারে মনোনিবেশ।

অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি মনীষীদের সমন্বয়ে ও তত্ত্ববোধিনী সভার মাধ্যমে তখন বাংলাদেশে এক নবযুগের সূচনা হয়েছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যে তত্ত্ববোধিনী সভার মত কোন সভা বাংলার বিদ্বজ্জন সমাজে এত ব্যাপক ভাবে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়নি। পাশ্চাত্ত্য বিদ্যাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েও, এই সভা দেশীয় ঐতিহ্যের যা-কিছু মহান তাকে দূরে ঠেলে দেয়নি। দু দেশের ভাবধারার এক অপূর্ব সমন্বয় করে বাংলার বিদ্বজ্জন সমাজকে সুস্থ আদর্শের পথ দেখিয়েছিল।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ছিল তখনকার দিনের একটি সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা। এই পত্রিকা সম্পাদনের জন্য অক্ষয়কুমারকে কঠিন পরিশ্রম করতে হতো। তার ফলে তিনি গুরুতর শিরোরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। তখন বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবে এবং তাঁরই চেষ্টায় তত্ত্ববোধিনী সভা থেকে অক্ষয়কুমারকে মাসিক পঁচিশ টাকা বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা হয়।

দেখতে দেখতে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের চাকরির পাঁচ বছর পূর্ণ হতে চললো। অতি সুনামের সঙ্গে কাজ করলেন বিদ্যাসাগর।

যে সব সিভিলিয়ানরা এ দেশে এসেছিলেন, তাঁরা বিদ্যাসাগরকে খুব ভালবাসতেন এবং শ্রদ্ধাও করতেন। 'কস্ট' নামে একজন সিভিলিয়ানের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের খুব সদ্ভাব ছিল। শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে তখন নানারূপ নির্দোষ হাস্য-পরিহাস ও কথাবার্তা চলতো। একদিন কস্ট সাহেব বিদ্যাসাগরকে তাঁর নামে একটি সংস্কৃত কবিতা লিখে দেবার জন্য অনুরোধ করলেন। বিদ্যাসাগর তখনই একটি কবিতা রচনা করে দিলেন।

পাণ্ডিত্যপূর্ণ কঠিন সংস্কৃত শ্লোক। কস্ট তার মর্ম বুঝতে পারলেন না। যখন তাঁকে অনুবাদ করে অর্থ বুঝিয়ে দেওয়া হলো তখন কস্ট খুবই আনন্দিত হলেন। কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ বিদ্যাসাগরকে দিলেন দুশো টাকা পুরস্কার।

বিদ্যাসাগর সে টাকা নিজে নিলেন না। সংস্কৃত রচনার জন্য সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পঞ্চাশ টাকা হিসাবে চার বছর দেবার জন্য কলেজের অধ্যক্ষের হাতে সেই টাকা তুলে দিলেন।

এই ঘটনার কিছুকাল পর সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কারের মৃত্যু হলো। সম্পাদক রসময় দত্তের ইচ্ছা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ঐ পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু ঐ পদের বেতন মাত্র পঞ্চাশ টাকা। বিদ্যাসাগর ঐ বেতনে রাজী হবেন কিনা সে বিষয়ে তাঁর সন্দেহ ছিল। তবু শিক্ষা পরিষদের সম্পাদক ডক্টর ময়েটকে একখানি পত্র লিখলেন। ঐ পত্রে বিদ্যাসাগরকে সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানালেন। বেতন বৃদ্ধির সুপারিশ করতেও তিনি ভুললেন না।

ডঃ ময়েট তখন ঐ পদের জন্য একজন সুযোগ্য লোকের সন্ধান করছিলেন। চিঠি পাওয়ার পর তিনি এ বিষয়ে ক্যাপ্টেন মার্শালের সঙ্গে পরামর্শ করতে গেলেন। মার্শাল বললেন—সংস্কৃতে পণ্ডিত এবং ইংরেজীও জানেন এমন লোক তো একজনই আছেন মনে হয়।

কৌতূহলী হয়ে ময়েট জিজ্ঞেস কলেন—সেই ব্যক্তিটি কে?

মার্শাল বললেন—পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

ময়েট বললেন—হ্যাঁ, আমি তাঁকেই এ কাজে নিয়োগ করতে চাই। রসময় দত্তও তাঁর কথা বলেছেন।

ময়েট নিশ্চিন্ত মনে বিদ্যাসাগরকে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের জন্য মনোনীত করলেন। কিন্তু বেতন বৃদ্ধির কোন আশ্বাস দিতে পারলেন না।

বিদ্যাসাগর চাকরি নিতে প্রথমে ইতস্ততঃ করলেন। কারণ রসময় দত্তের কার্যকলাপের ওপর তিনি বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন না। সংস্কৃত কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যাকরণ-অধ্যাপকের পদে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ পরীক্ষা দিয়ে প্রথম হলেও রসময় দত্ত তাঁকে সেই চাকরি দেননি। দিয়েছিলেন কলেজের লাইব্রেরীয়ানের চাকরি। বিদ্যাসাগর মার্শাল সাহেব ও ডঃ ময়েটকে ধরে বিদ্যাভূষণকে তাঁর প্রার্থিত চাকরিতে বহাল করেছিলেন।

বিদ্যাসাগর নানা কথা চিন্তা করে মার্শাল সাহেবকে বললেন—সেখানে যদি মতান্তর হয় তা হলে আমি চাকরি ছেড়ে দেবো। কোন অন্যায়ের প্রশ্রয় নিয়ে আমি চাকরি করতে পারবো না।

মার্শাল সাহেব বললেন—বেশ তাই হবে।

বিদ্যাসাগর বললেন—তবে একটি শর্ত আছে।

—কি শর্ত?

আমি কাজ ছাড়তে বাধ্য হলে আমার বাবা খুব অসুবিধায় পড়বেন। আমার মেজো ভাই দীনবন্ধু অতি পণ্ডিত লোক। তাকে আপনি যদি সেরেস্তাদারের কাজে নিযুক্ত করতে রাজী থাকেন তবেই আমি সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করতে পারি।

মার্শাল সাহেব তাতেই রাজী হলেন। তখন বিদ্যাসাগরের চাকরি নিতে আর কোন বাধা রইলো না। পঞ্চাশ টাকা মাইনেতে তিনি সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হলেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে তাঁর শূন্যস্থান পূরণ করলেন তাঁরই মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন।

বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে ঢুকে তার শ্রীবৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দিলেন। তিনি দেখলেন, সংস্কৃত কলেজ নামেই কলেজ, পাকা দালানে অবস্থিত টোল ছাড়া আর কিছু নয়। হাতে-লেখা পুঁথিগুলি জীর্ণশীর্ণ, সেগুলি সংস্কার করার কোন ব্যবস্থা নেই। তা ছাড়াও কলেজের কাজকর্মে নানারকম বিশৃঙ্খলা। অধ্যাপক বা ছাত্র কারুর আসা-যাওয়ার সময় নির্দিষ্ট ছিল না। যাঁর যখন ইচ্ছে কলেজে আসতেন, আবার ইচ্ছে মতোই কলেজ ছেড়ে চলে যেতেন। অধ্যাপকরা ছাত্রদের পড়াতেন ঢালা বিছানায় তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে। পড়াতে পড়াতে অনেক সময় ঘুমিয়ে পড়তেন।

ছাত্রজীবনেও তিনি এই দৃশ্য দেখেছেন, এতকাল পরেও তার কোন পরিবর্তন হয়নি।

কিছুদিনের মধ্যেই বিদ্যাসাগর তার সংস্কার সাধন করলেন। নিয়ম করে দিলেন দশটায় কলেজ বসবে আর চারটায় ছুটি হবে। কি অধ্যাপক, কি ছাত্র, সকলকেই ঠিক দশটার সময় হাজিরা দিতে হবে। ছাত্ররা যখন তখন কলেজ থেকে বেরিয়ে যাবে সে প্রথাও বন্ধ করে দিলেন। নিয়ম করলেন, সব ছাত্রকেই কাঠের তৈরী পাস নিয়ে বাইরে যেতে হবে। এতকাল পড়া শুরু হবার আগে অথবা পড়ার মাঝখানে কোন কোন ছাত্র ক্লাস থেকে বেরিয়ে যেতো। পাস-এর ব্যবস্থা হওয়ায় সেটাও বন্ধ হয়ে গেল। এ ভাবে বিদ্যাসাগর কলেজের শৃঙ্খলা অনেক ফিরিয়ে আনলেন।

বিদ্যাসাগর একটা বিশেষ কাজে একদিন গেলেন হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ কার্ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। কার্ সাহেব তখন ইজিচেয়ারে সামনের টেবিলের ওপর পা তুলে বসে আছেন। বিদ্যাসাগর যথারীতি সৌজন্যসূচক অভিবাদন জানালেন, কিন্তু সাহেব তাঁকে বসতে পর্যন্ত বললেন না। বিদ্যাসাগর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে চলে এলেন।

এ ব্যাপারে খুবই অপমানিত বোধ করলেন বিদ্যাসাগর। অপমানের জ্বালায় তিনি জ্বলতে লাগলেন। অথচ মুখে কাউকে কিছু বললেন না।

কিছুদিন পরেই এই অপমানের প্রতিশোধ নেবার এক মস্ত বড় সুযোগ এলো। একদিন কার্ সাহেব বিদ্যাসাগরের কাছেই একটি কাজে সংস্কৃত কলেজে এসে উপস্থিত হলেন।

বিদ্যাসাগর তখন তাঁর অফিস ঘরে বসে কাজ করছিলেন। খবর পেলেন —কার্ সাহেব এসেছেন। তখনই তিনি তাঁর সেই মুখ-বাঁকা চটি জুতো পরা পা দুখানি সামনের টেবিলের ওপর তুলে দিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন।

একটু পরেই কার্ সাহেব ঢুকলেন সেই ঘরে। বিদ্যাসাগর তাঁকে বসতেও বললেন না।

সাহেব মনে মনে খুবই চটে গেলেন। তাড়াতাড়ি কোনরকমে কাজ সেরে ফিরে গেলেন হিন্দু কলেজে। গিয়ে তখনই ময়েট সাহেবের কাছে অভিযোগ পাঠালেন।

হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষের অভিযোগ—কাজেই ময়েট সাহেব তা অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। তিনি বিদ্যাসাগরের কাছে কৈফিয়ত তলব করে পাঠালেন।

কৈফিয়তে বিদ্যাসাগর বেশ মোলায়েম ভাষায় জানালেন—আমরা কালা আদমী, ইংরেজী মতে অভ্যর্থনা করতে জানি না, তাই কার্ সাহেব অভ্যর্থনা করার রীতিটা আমাকে শিখিয়ে দিয়েছেন। আমি এরূপ অভ্যর্থনাই শিখেছিলাম সুসভ্য কার্ সাহেবের কাছে। কার্ সাহেবের দরকার হয়েছিল তাই তিনি আমার অফিসে এসেছিলেন। আমি তাঁরই শেখানো রীতিতে ঐ ভাবে তাঁকে অভ্যর্থনা করেছিলাম। এতে আমার কোন অন্যায় হয়েছে বলে মনে করি না।

ময়েট সাহেব সেই কৈফিয়ত সহ কার্ সাহেবের সঙ্গে দেখা করলেন। তখন সব কিছু জেনে বুঝতে পারলেন ঘটনার তাৎপর্য। এতে বিদ্যাসাগরের মনের জোরের এবং আত্মসম্মান জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে তিনি মুগ্ধ হলেন। কার্ সাহেবকে বললেন—আপনি বিদ্যাসাগরের সঙ্গে এই ব্যাপারটা মিটিয়ে নিন।

কার্ সাহেব তখন নিজের ত্রুটি বুঝতে পারলেন। তারপর একদিন নিজেই গেলেন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে। বিদ্যাসাগর সেদিন কার্ সাহেবের সঙ্গে মধুর ব্যবহার করলেন, আন্তরিকতার সঙ্গে করলেন দুজনে করমর্দন।

এই সময়ে সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ শূন্য হলো। মাইনে নব্বই টাকা। ময়েট সাহেবের ইচ্ছা ঐ পদে বিদ্যাসাগরকে নিযুক্ত করা হোক। কিন্তু মাইনে বেশী হলেও বিদ্যাসাগর ঐ চাকরি নিতে অস্বীকার করলেন। কারণ, সংস্কৃত কলেজের ভিতরকার গলদ দূর করতে হলে বর্তমান পদে থাকাই তাঁর উচিত। এখনো যে অনেক কাজ বাকী! তখন তাঁর মনে পড়লো বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কারের কথা। তিনি তখন কৃষ্ণনগর কলেজের প্রধান পণ্ডিত। সাহিত্য-শাস্ত্রে জ্ঞান তাঁর অগাধ। তিনি ঐ পদের উপযুক্ত বিবেচনা করে তাঁর নামই বিদ্যাসাগর সুপারিশ করলেন। তর্কালঙ্কারের চাকরি হয়ে গেল।

বিরাট উদ্যম আর উৎসাহ নিয়ে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের গলদ দূর করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু পদে পদে এলো বাধা।

বিদ্যাসাগর এক উন্নত প্রণালীর পঠন ব্যবস্থার রিপোর্ট তৈরি করলেন। কলেজের সম্পাদক রসময় দত্ত এতে খুব উৎসাহ দেখালেন না। তবু নিয়ম অনুযায়ী সেই রিপোর্টের প্রধান প্রস্তাবগুলো শিক্ষা-পরিষদে পেশ করলেন। রসময় দত্ত ভেবেছিলেন শিক্ষা-পরিষদ্ প্রস্তাবগুলো অনুমোদন করবে না।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, শিক্ষা-পরিষদ্ সমস্ত প্রস্তাবগুলো বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করলো। সংস্কৃত কলেজের পাঠ্য বিষয় ও রুটিন অনেক পালটে গেল। এত পরিবর্তনের বহর দেখে রসময় দত্ত শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কায় নিজের ক্ষমতার বলে তিনি বিদ্যাসাগরের অনেক প্রস্তাব একেবারে বাতিল করে দিলেন।

এতে বিদ্যাসাগরের আত্মসম্মানে আঘাত লাগলো। হতে পারেন তিনি সহকারী সম্পাদক, কিন্তু কলেজের উন্নতির জন্যই তো তিনি এসব করছেন। রসময় দত্ত তাঁর চেয়ে বেশী ক্ষমতাবান বলে প্রস্তাব এমন অন্যায় ভাবে বাতিল করে দেবেন। এ অসহ্য!

বিদ্যাসাগর স্থির করলেন চাকরি ছেড়ে দেবেন।

আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবরা খবর শুনে অবাক্। তারা বললো—চাকরি ছেড়ো না। চাকরি গেলে খাবে কি।

বিদ্যাসাগর বললেন—আলু পটল বেচে খাবো, মুদীর দোকান করবো, তবু যে পদে সম্মান নেই, সে পদে আর থাকবো না।

রসময় দত্ত অনেক অনুরোধ করলেন। ময়েট সাহেব বললেন—বিদ্যাসাগর, চাকরি আপনি ছাড়বেন না।

কিন্তু বিদ্যাসাগরের এক গোঁ। কেউ তাঁর মত ফেরাতে পারলো না। চাকরি তিনি ছেড়ে দিলেন।

চাকরি ছাড়ার পর বেশ একটু অসুবিধায় পড়লেন বিদ্যাসাগর। তবু দমলেন না। কলকাতার বাসায় কয়েকজন অনাথ ছাত্র আহার করতো, তাদের বিদায় দিয়ে অনায়াসে খরচ কমাতে পারতেন, কিন্তু তা করলেন না। ভাই দীনবন্ধু যে বেতন পেতেন তাতে কলকাতার বাসা খরচ চলতে লাগলো। বিদ্যাসাগর প্রতিমাসে ধার করে বাড়িতে বাবার কাছে টাকা পাঠাতে লাগলেন।

কিন্তু এভাবে কতদিন চলবে? হঠাৎ তাঁর মাথায় খেয়াল চাপলো, বই লিখবেন। তবেই এই অভাব ও অসুবিধা কিছুটা দূর হবে।

এই সময়ে একদিন ময়েট সাহেবের সঙ্গে দেখা। তিনি বললেন—পণ্ডিত আপনি তো বসেই আছেন, আমার কয়েকটি বন্ধুকে এক ঘণ্টা করে বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দী পড়ান না।

বিদ্যাসাগর রাজী হলেন। পড়ালেন প্রায় ছ'মাস। ময়েট সাহেবের সেই বন্ধুরা চাকরি পেয়ে চলে গেলেন অন্য জায়গায়। যাবার সময় তাঁরা কয়েক মাসের পারিশ্রমিক হিসেবে প্রায় চারশো টাকা বিদ্যাসাগরের হাতে তুলে দিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর সে টাকা নিতে রাজী হলেন না। বললেন—ও টাকা আমি নিতে পারি না। আপনারা ময়েট সাহেবের বন্ধু—আর তাঁর সঙ্গে আমারও হৃদ্যতা আছে। আমি বন্ধুর কাজ করে দিয়ে টাকা নেবো কি করে?

সে সময় বিদ্যাসাগর কষ্টে পড়েছিলেন, দেনাও তাঁর হয়েছিল কিছু টাকা। তবু শিষ্টতার ত্রুটি হবে বলে সাহেবদের কাছ থেকে কোন পারিশ্রমিক নিলেন না।

বই লিখতে শুরু করলেন বিদ্যাসাগর। এর আগেই অবশ্য বই লেখায় তাঁর হাতে-খড়ি হয়েছিল। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অল্প সময়ে সংস্কৃত শেখাবার জন্য এক রাত্রির মধ্যে একখানি বই লিখেছিলেন—তার নাম উপক্রমণিকা। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রথম চাকরি নেবার পর কলেজের কর্তৃপক্ষ তাঁকে বাংলা গদ্যপুস্তক লিখবার অনুরোধ করেছিলেন। লিখেও শেষ করেছিলেন সেই বই। নাম্ 'বাসুদেব চরিত'। বাংলা ভাষায় বিদ্যাসাগরের প্রথম গদ্য রচনা। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কর্তৃপক্ষ বইখানি পাঠ্যপুস্তক হিসাবে অনুমোদনও করেছিলেন। কিন্তু বইটি প্রকাশিত হয়নি।

মার্শাল সাহেব একদিন অনুরোধ করলেন—পণ্ডিত, একটা বই লিখবেন?

বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করলেন—কি বই?

মার্শাল সাহেব বললেন—হিন্দী 'বেতাল পচ্চিসী'র বাংলা অনুবাদ করুন, ছেলেদের খুব ভালো লাগবে।

বিদ্যাসাগর 'বেতাল পচ্চিসী'র অনুবাদ করতে শুরু করলেন। হিন্দী ভাষায় তাঁর অসামান্য দখল। কাজেই কোন অসুবিধা হলো না।

বাংলা ভাষায় 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' বের হলো। কিন্তু বইটির তেমন সমাদর হলো না। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কর্তৃপক্ষও প্রথমে বইটিকে পাঠ্যরূপে অনুমোদন করলেন না। শেষে শ্রীরামপুরের পাদ্রীদের চেষ্টায় পাঠ্য হলো। তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কর্তৃপক্ষ তিনশো টাকা দিয়ে একশোখানা বই কিনলেন।

ক্রমে ক্রমে বইটি জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। সে যুগের শ্রেষ্ঠ পুস্তক বলে স্বীকৃত হলো। অবশ্য প্রথম সংস্করণে বইটিতে অনেক সমাসবহুল এবং কঠিন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছিল। বিদ্যাসাগর তা বুঝতে পেরে পরবর্তী সংস্করণে অনেক পরিবর্তন করে দিলেন।

সাহিত্য হিসাবে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'ই এ যুগের বাংলা ভাষার প্রথম গ্রন্থ। বিদ্যাসাগরের এই বই থেকেই বাংলা ভাষায় নবযুগের সূচনা হয়।

এর পর বিদ্যাসাগর লিখলেন বাংলার ইতিহাস। বইখানি স্কুলে পাঠ্য হলো। তারপর ইওরোপের গ্রীস, ইংলন্ড প্রভৃতি দেশের বীরগণের বীরত্বের কাহিনী নিয়ে লিখলেন জীবন চরিত। এইভাবে চলতে লাগলো তাঁর বই লেখা।

দেখতে দেখতে কেটে গেল দুবছর। এই সময়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে হেড রাইটারের পদ খালি হলো। মার্শাল সাহেব বিদ্যাসাগরকে ঐ পদটি নেবার জন্য অনুরোধ জানালেন। বিদ্যাসাগর অনুরোধ এড়াতে পারলেন না। চাকরিটি নিলেন। বেতন আশি টাকা।

সেই সময় বিদ্যাসাগর সিনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষার বাংলা ভাষার পরীক্ষক নিযুক্ত হলেন। তার ওপর পেলেন আর একটি কাজ। সংস্কৃত কলেজের জুনিয়ার ও সিনিয়ার বিভাগের বাৎসরিক পরীক্ষার ভারও তাঁর ওপর দেওয়া হলো। বিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত ডাঃ রোয়ার ছিলেন অন্যতম পরীক্ষক। সংস্কৃতজ্ঞ হলেও রোয়ার সাহেব সংস্কৃত প্রশ্নপত্র তৈরির ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের সাহায্য নিতেন। এর জন্য বিদ্যাসাগর যে পারিশ্রমিক পেতেন তা তিনি নিজে খরচ করতেন না। কোন না কোন সৎকাজে দান করতেন। সে বছর সিনিয়ার পরীক্ষায় কাব্যে ও অলংকারে যে ছাত্রটি প্রথম হয়েছিল তাকে এক সেট সংস্কৃত মহাভারত কিনে উপহার দিলেন এবং বাকী টাকা দীন-দরিদ্রের মধ্যে দান করলেন।

কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের চাকরি বিদ্যাসাগরকে বেশীদিন করতে হলো না। মদনমোহন তর্কালঙ্কার মুর্শিদাবাদে জজ পণ্ডিতের চাকরি নিয়ে চলে গেলেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকের পদ আবার খালি হলো।

শিক্ষা-পরিষদের সেক্রেটারী ডঃ ময়েট বিদ্যাসাগরকে অনুরোধ করলেন—আপনি এই চাকরিটি নিন।

বিদ্যাসাগর বললেন—না, আমার ওপর এখন অনেক কাজের ভার। এ অবস্থায় এই চাকরি নেওয়া চলে না।

তবু ডঃ ময়েট বার বার অনুরোধ করতে লাগলেন। কারণ বিদ্যাসাগর হচ্ছেন এই পদের যোগ্যতম ব্যক্তি।

তখন বিদ্যাসাগর বললেন—যদি শিক্ষা-পরিষদ্ আমাকে অধ্যক্ষের ক্ষমতা দেন, তা হলে এই পদ নিতে পারি।

ময়েট সাহেব তাতেই রাজী হলেন। অধ্যক্ষের ক্ষমতা নিয়েই বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক-পদ গ্রহণ করলেন। তখন ১৮৫০ সালের ডিসেম্বর মাস।

রসময় দত্ত তখনও সম্পাদক। কিন্তু কলেজের শৃঙ্খলা রক্ষা ও তার উন্নতির দিকে মোটেই তাঁর দৃষ্টি নেই। দিনে দিনে সংস্কৃত শিক্ষার দিকে

লোকের ঝোঁক কমে আসছে, ছাত্র কমছে। শিক্ষা-পরিষদ্ দেখলেন, পুরনো সম্পাদকের দ্বারা কোন কাজ হবে না। চাই নূতন কর্মশক্তি ও নূতন পরিকল্পনা। ডঃ ময়েট বিদ্যাসাগরকে বললেন—সংস্কৃত কলেজের প্রকৃত অবস্থা কি, কি ভাবে এর উন্নতি হতে পারে তার একটি রিপোর্ট আপনি তৈরি করে দিন।

বিদ্যাসাগর তাই চান। তাঁর উদ্দেশ্য শুধু চাকরি নয়, তিনি চান কলেজের উন্নতি ও শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতি। অনেক চিন্তা ভাবনা করে ও পরিশ্রম সহকারে বিদ্যাসাগর রিপোর্ট তৈরি করলেন।

সংস্কৃত শিক্ষাকে কত সহজ এবং শিক্ষার সময়কে কত সংক্ষিপ্ত করা যায়, রিপোর্টে তিনি তাই দেখালেন। ব্যাকরণ শিক্ষার সময়কেও সংক্ষেপ করবার অনুরোধ জানালেন। কি উপায়ে সংক্ষেপ করা যাবে তারও নির্দেশ দিলেন।

সংস্কৃত কলেজে গোড়ার দিকে ইংরেজী পড়ানো না হলেও সেই সময়ে ইংরেজী পড়ানো হতো। কিন্তু যেভাবে পড়ানো হতো সেই ব্যবস্থা ছিল খুবই অসন্তোষজনক। তাতে অধিকাংশ ছাত্রই, হয় ইংরেজী অথবা সংস্কৃত শিক্ষায় অবহেলা প্রদর্শন করতো। বিদ্যাসাগর তাঁর রিপোর্টে বললেন, ছাত্রেরা সংস্কৃত ভাষায় কিছু পারদর্শিতা দেখাতে না পারলে তাদের ইংরেজী ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করতে দেওয়া উচিত হবে না। ইংরেজী শিক্ষা ইচ্ছাধীন না হয়ে হবে অবশ্য-পাঠ্য।

রিপোর্টে বিদ্যাসাগর আরও অনেক বিষয়ের অবতারণা করলেন। ছাত্র ও অধ্যাপকদের উপস্থিতি ও শ্রেণীত্যাগ ইত্যাদি বিষয়ে কঠোর সমালোচনা করে বললেন, অন্যান্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে যেরূপ নিয়ম শৃঙ্খলা আছে, সংস্কৃত কলেজেও কেন তা প্রবর্তিত হবে না?

বিদ্যাসাগরের চিন্তাধারা ছিল সংকীর্ণতামুক্ত, দৃষ্টিভঙ্গী ছিল উন্নত। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, প্রাচীন ঐতিহ্যকে নিয়ে বসে থাকলে চলবে না। যুগ-প্রবাহের উত্তাল তরঙ্গের মুখে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে। ছাত্রদের কণ্ঠ থেকে যুগপৎ বেরিয়ে আসবে কালিদাস ও সেক্সপীয়রের কাব্যধারা।

ডঃ ময়েট বিদ্যাসাগরের রিপোর্টের মধ্য দিয়ে তাঁর দূরদর্শিতা ও সংগঠনী প্রতিভার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হলেন। সেই রিপোর্ট শিক্ষা-পরিষদ্ কর্তৃক গৃহীত হলো।

রসময় দত্ত দেখলেন, প্রভাব প্রতিপত্তি নিয়ে আর তাঁর সম্পাদক পদে বহাল থাকা চলবে না। তাই তিনি পদত্যাগ করলেন।

এতকাল সম্পাদক এবং সহকারী সম্পাদক এই দুজনের দ্বারা অধ্যক্ষের

কাজ পরিচালনা করা হতো। এখন দুটি পদ একত্র করে অধ্যক্ষের নূতন পদ সৃষ্টি করা হলো। দুজনে বেতন পেতেন মোট দেড়শো টাকা। এই নূতন পদের জন্যও দেড়শো টাকা বেতন ধার্য করা হলো। সেই পদে নিযুক্ত হলেন বিদ্যাসাগর। সংস্কৃত কলেজের তিনিই প্রথম অধ্যক্ষ।

অধ্যক্ষের পদে আসীন হয়েই বিদ্যাসাগর সংস্কারের কাজে হাত দিলেন। কলেজের পুরনো হাতের লেখা পুঁথিগুলো জীর্ণশীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, সেগুলো ছাপার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। তারপর মন দিলেন নিয়ম-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার কাজে। অবশ্য এজন্য তাঁকে খুবই বেগ পেতে হলো। এখন তিনি কলেজের সর্বময় কর্তা, অথচ অনেক অধ্যাপকেরই তিনি ছাত্র। কেউ দেরি করে আসলে মুখের সামনে তিনি কিছু বলতে পারেন না। তখন এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করলেন।

হয়তো কলেজের কাজ শুরু হয়ে গেছে, তখনও কোন কোন অধ্যাপক আসেননি। সেই সময় উপরতলার ঘর থেকে হয়তো বিদ্যাসাগর দেখলেন কোন এক অধ্যাপক আসছেন। তখনই সেখান থেকে নেমে এসে ফটকের কাছে দাঁড়ালেন, অধ্যাপকের মুখোমুখি হতেই তিনি বললেন—এই এলেন নাকি?

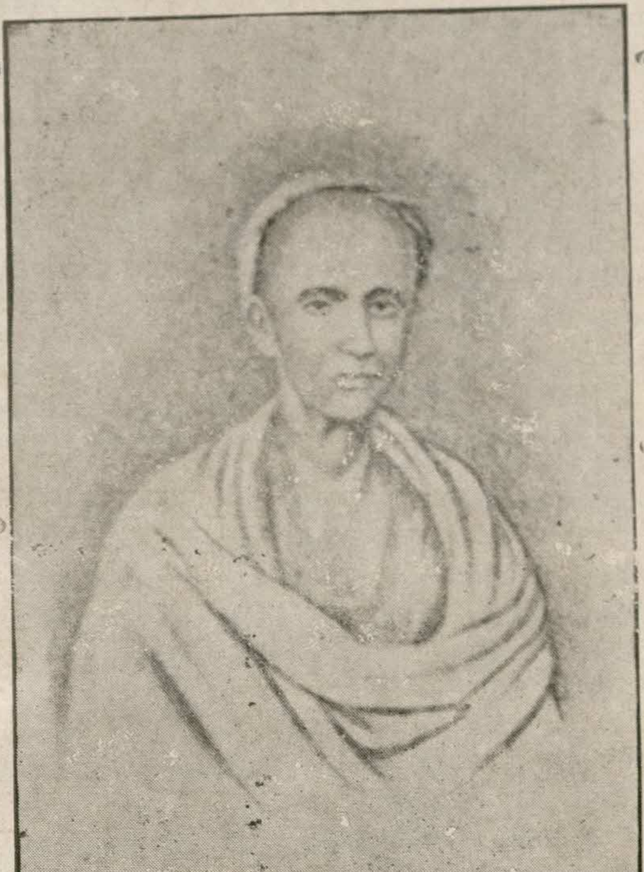
লজ্জা পেয়ে অনেক অধ্যাপকদেরই ঠিক সময়ে না-আসার অভ্যাস দূর হয়ে গেল। তবে বৃদ্ধ অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কপঞ্চানন দেরি করে আসার অভ্যাস অনেকদিন পর্যন্ত কাটাতে পারেননি। বিদ্যাসাগর মুখে তাঁকে কিছু বলতেন না। কিন্তু তাতেই তর্কপঞ্চানন লজ্জিত হতেন। একদিন বললেন —কি জ্বালা! কিছু জিজ্ঞেস করলে বরং জবাব দিতে পারতাম। এতে যে জবাব দেবারও কিছু নেই।

শেষ পর্যন্ত তিনিও ঠিক সময়ে আসতে লাগলেন।

এতকাল সংস্কৃত কলেজে নিয়ম ছিল—কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছাত্ররাই পড়তে পারবে। বিদ্যাসাগর সেই নিয়ম তুলে দিলেন। নিয়ম করলেন—সকল জাতের ছাত্ররাই সংস্কৃত কলেজে পড়তে পারবে। অন্যান্য অধ্যাপকরা এতে আপত্তি তুললেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর বললেন—অন্য জাতের ছেলেরা কেন সংস্কৃত পড়তে পারবে না? অধ্যাপকেরা মাইনে নিয়ে সাহেবদের সংস্কৃত শেখান, তাতে কোন দোষ হয় না!

বিরুদ্ধবাদীরা এই যুক্তিপূর্ণ কথায় কোন জবাব দিতে পারলেন না। কাজেই সংস্কৃত কলেজের দ্বার সর্বশ্রেণীর জন্য উন্মুক্ত হলো।

আগে সংস্কৃত কলেজে পড়বার জন্য ছাত্রদের কাছ থেকে কোন বেতন নেওয়া হতো না। তার ফলে বিনা বাধায় ছাত্ররা ভরতি হতো, আবার সুযোগ সুবিধা পেলেই অন্য ইংরেজী স্কুলে চলে যেতো। এই ধরনের



পিতা—ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

অপ্রীতিকর অবস্থা দূর করার জন্য বিদ্যাসাগর দু টাকা প্রবেশ-দক্ষিণা ধার্য করলেন। কোন কারণে নাম কাটা যাওয়ার পর আবার ভরতি হতে হলেও দু টাকা দিতে হবে।

এর জন্যও বিদ্যাসাগরকে কম প্রতিবাদের সম্মুখীন হতে হয়নি। কিন্তু তিনি ছিলেন নিজের সিদ্ধান্তে অচল অটল।

এই ব্যবস্থার সুফল অবশ্য অল্পদিনের মধ্যেই দেখা দিল। অস্থিরচিত্ত ছাত্রদের চৈতন্যোদয় হলো। কলেজে নিয়মিত উপস্থিতির সংখ্যা দিনে দিনেই বাড়তে লাগলো।

বিদ্যাসাগর ইংরেজী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করলেন। ব্যবস্থা তো হলো, কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষক কোথায় পাওয়া যায়! হিন্দু কলেজের কৃতী ছাত্র, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী তখন সেই কলেজেই চল্লিশ টাকা মাইনেতে চাকরি করছিলেন। তাঁকে একশো টাকা বেতন দিয়ে ইংরেজীর প্রধান শিক্ষক করে নিয়ে এলেন। গুণীর যথাযথ মর্যাদা দিতে তিনি কখনো কার্পণ্য করেননি।

এর কিছুদিন পরেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রবর্তন হলো। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজ থেকেও কিছু ছাত্র পাঠালেন। তারা ভালভাবেই কৃতকার্য হলো। তাতে বিদ্যাসাগরের কী আনন্দ!

গরমের দিনে ছাত্রদের স্কুলে যাতায়াত করা এবং পড়াশোনা করার খুবই কষ্ট হয়। শিক্ষা-পরিষদ্‌কে অনুরোধ করে সংস্কৃত কলেজে প্রায় দু মাস গরমের ছুটি প্রবর্তন করলেন। বাংলা দেশে স্কুল-কলেজে যে গ্রীষ্মের ছুটি হয়ে থাকে, বিদ্যাসাগরই তার প্রথম প্রবর্তক।

এই সময়ে তিনি কয়েকখানি বইও লিখলেন। আগে যে উপক্রমণিকা লিখেছিলেন, সেখানি এবার ছেপে প্রকাশ করলেন। তা ছাড়াও সহজভাবে সংস্কৃত পড়বার জন্য পঞ্চতন্ত্র, রামায়ণ, হিতোপদেশ, মহাভারত প্রভৃতি বই থেকে কাহিনী নিয়ে তিন খণ্ডে একখানি বই লিখে ফেললেন—তার নাম ঋজুপাঠ। সেই বই ছেপেও প্রকাশ করলেন।

বিদ্যাসাগরের অক্লান্ত চেষ্টায় ও পরিশ্রমে সংস্কৃত কলেজের নানারকম উন্নতি হতে লাগলো। কর্তৃপক্ষ তাঁর উপযুক্ত মর্যাদাও দিলেন। তাঁর বেতন বেড়ে হলো তিনশো টাকা। তবে বেতন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কাজও বাড়লো।

বাংলা দেশে এর আগে লর্ড হার্ডিঞ্জ ও বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে যে সব পাঠশালা স্থাপিত হয়েছিল, সেগুলোর অবস্থা তখন শোচনীয়। না আছে ভালো পাঠ্যপুস্তক, না আছে উপযুক্ত শিক্ষক। পরিচালনার কোন ভালো ব্যবস্থা নেই। সরকারও এ ব্যাপারে নিরুৎসাহ হয়ে পড়লেন। এই সময়ে বাংলার ছোটলাট হয়ে এলেন ফ্রেডারিক জে হ্যালিডে। তিনি আবার শিক্ষা-পরিষদের সদস্য।

হ্যালিডের আগ্রহে বাংলা দেশের স্কুলগুলির উন্নতি করার ও নূতন স্কুল স্থাপন করার প্রচেষ্টা চলতে লাগলো। তবে এই ব্যাপারে বিদ্যাসাগরও সহযোগিতা করলেন। হ্যালিডে সাহেব বিদ্যাসাগরের উপরেই ভার দিলেন নূতন স্কুল স্থাপনের স্থান নির্বাচন করার।

ছুটির সময়ে বিদ্যাসাগর হুগলী জেলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে এসে ছোটলাটের কাছে রিপোর্ট পাঠালেন। রিপোর্টে তিনি লিখলেন যে প্রত্যেক গ্রামের লোকদের স্কুল-প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। চব্বিশ পরগনা, নদীয়া, বর্ধমান প্রভৃতি জেলার স্কুল-প্রতিষ্ঠার উপযোগী গ্রামগুলি সম্বন্ধেও তিনি তথ্য সংগ্রহ করলেন।

বাংলায় শিক্ষা বিস্তারের নূতন উদ্যোগ শুরু হলো। তার উদ্যোক্তা হলেন বিদ্যাসাগর। শিক্ষা-পরিষদ বা এডুকেশন কাউন্সিল উঠে গিয়ে নূতন এক সংস্থা স্থাপিত হলো—তার নাম ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন। ডঃ ময়েটের স্থলে তরুণ সিবিলিয়ান গর্ডন ইয়ং নিযুক্ত হলেন প্রথম ডিরেক্টর।

জায়গায় জায়গায় স্কুল গড়ে উঠলো। এখন স্কুলের জন্য চাই শিক্ষক! শিক্ষক তৈরি করার জন্য বিদ্যাসাগরের পরামর্শেই নর্মাল স্কুল স্থাপিত হলো।

ছুটির সময়ে বিদ্যাসাগর দেশে গেলেন। বাবাকে বললেন—বাবা, বীরসিংহে আমি একটি উচ্চ ইংরেজী স্কুল করতে চাই।

ঠাকুরদাস খুশী হয়ে বললেন—বেশ, করো।

বিদ্যাসাগর সেদিনই স্কুলের জন্য জায়গা ঠিক করে ফেললেন। পরদিনই ভিত্তি স্থাপন করা হবে স্থির হয়ে গেল। কিন্তু সেদিন মজুর পাওয়া গেল না। তাই বলে কাজ বন্ধ রইলো না। বিদ্যাসাগরের পাশে এসে দাঁড়ালেন তাঁর দু ভাই, দীনবন্ধু ও শম্ভুচন্দ্র। কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে জমি তৈরি করতে লাগলেন। তারপর দেখাদেখি গাঁয়ের লোকেরাও এগিয়ে এলো। অল্প দিনের মধ্যেই তৈরি হয়ে গেল স্কুলের ঘর। দলে দলে ছাত্র এসে ভরতি হলো।

বিদ্যাসাগর স্কুলের নাম দিলেন—"ভগবতী বিদ্যালয়।"

গরিব চাষী, মজুর প্রভৃতি ছেলেদের সেই উচ্চ ইংরেজী স্কুলে পড়তে অসুবিধা হবে ভেবে তাদের জন্য 'নৈশ বিদ্যালয়' খুলে দিলেন। সেই স্কুলে যে সব ছেলে পড়তো তাদের মাইনে দিতে হতো না। তার ওপর সবাই পেতো পড়বার বই, কাগজ, কলম, শ্লেট, পেনসিল আরো কত কি। তা ছাড়া স্কুলে যাঁরা শিক্ষক ছিলেন তাঁদের মাইনে ও অন্যান্য সব নিয়ে মাসে খরচ হতো তিনশো টাকা। সবই বিদ্যাসাগর বহন করতেন।

বিদ্যাসাগর নিজে তখন বেতন পান তিনশো টাকা। তাঁর বইয়ের কিছু আয় ছিল বলে ঐ স্কুলের খরচ চালাতে পারতেন।

এদিকে সরকারী উদ্যমে স্কুল স্থাপনের কাজও এগিয়ে চলেছে।

দেখতে দেখতে কেটে গেল প্রায় তিন বছর। তখন আর একটি অসুবিধা দেখা দিল। স্কুলগুলির জন্য পরিদর্শক চাই।

এ ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের মত যোগ্য আর কে আছে? কাজেই তাঁকেই দেওয়া হলো এ কাজের ভার। স্থির হলো এই কাজের জন্য তাঁকে দেওয়া হবে মাসে দুশো টাকা বেতন আর যাতায়াতের খরচ।

এখন বিদ্যাসাগর দুটি পদের জন্য বেতন পেতে লাগলেন মাসে পাঁচশো টাকা। বিদ্যালয় পরিদর্শনের কাজে তাঁকে মাঝে মাঝেই নানা স্থানে যেতে হতো। অনেক জায়গায় তিনি পালকিতে যেতেন। পথে কোন পীড়িত লোককে পড়ে থাকতে দেখলে পালকি থেকে নেমে তিনি সেই পীড়িত লোককে পালকির ভেতর তুলে নিতেন আর নিজে যেতেন হেঁটে। পথে কোন চটি পেলে পীড়িত লোকটিকে চটিতে রেখে চটির মালিককে টাকা পয়সা দিয়ে সেবা শুশ্রূষার ব্যবস্থা করতে বলতেন। টাকা, আধুলি, সিকি সব সময় তাঁর সঙ্গেই থাকতো। অবস্থা অনুসারে তিনি তা দান করতেন।

কোথাও গিয়ে যদি শুনতেন অন্নাভাবে বা অর্থাভাবে কারো লেখাপড়া হচ্ছে না, তখন বিদ্যাসাগর তার কোন ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারতেন না।

কালীচরণ ঘোষ ছিলেন ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ। তাঁকে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু তাঁর বয়স ছিল খুব কম। সেজন্য ছেলেরা মন দিয়ে তাঁর ক্লাসে পড়তো না—গোলমাল করতো। আবার কেউ কেউ তাঁকে কলেজ থেকে তাড়াবার চেষ্টাও করছিল। বিদ্যাসাগর তা জানতে পেরে একদিন ক্লাসে গিয়ে ছেলেদের জিজ্ঞেস করলেন—তোরা কে কে কালীবাবুকে কলেজ থেকে তাড়াবার চেষ্টা করছিস বল্‌?

কেউ স্বীকার করলো না। বিদ্যাসাগর রেগে গিয়ে সব ছাত্রকে ক্লাস থেকে বের করে দিলেন।

ছাত্ররা কলেজের কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করলো। কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের কৈফিয়ত তলব করলেন।

ছাত্ররা ভাবলো, এবার বিদ্যাসাগরের নিশ্চয় চাকরি যাবে। আর চাকরি গেলেই তাঁকে ধরতে হবে দাঁড়িপাল্লা।

এদিকে কর্তৃপক্ষ সব কিছু জেনে বিদ্যাসাগরের উপরই এর বিচারের ভার দিলেন। ছাত্রদের তখন মুখ শুকিয়ে গেল। অনেক ছাত্রের অভিভাবক

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করলেন। বিদ্যাসাগর তাঁদের বললেন—ছেলেদের কালীবাবুর কাছে ক্ষমা চাইতে বলুন।

ছাত্ররা তখন কালীবাবুর কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইলো। কালীবাবু তাদের সঙ্গে করে নিয়ে এলেন বিদ্যাসাগরের কাছে। বিদ্যাসাগর মৃদু হেসে বললেন —ওরে মুখ্যুরা, দাঁড়িপাল্লা কে ধরবে রে?

সব ছাত্ররা মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলো। কারুর চোখ দিয়ে জলও পড়তে লাগলো। বিদ্যাসাগর কালীচরণ বাবুকে জিজ্ঞেস করলেন—কালীচরণ, তোমার কাছে ছেলেরা ক্ষমা চেয়েছে তো?

কালীবাবু নীরব সম্মতি জানালেন। ছেলেরা কেউ কেউ বিদ্যাসাগরের পায়ে ধরে ক্ষমা চাইলো। বিদ্যাসাগর বললেন—থাক, থাক। আর কখনো এমন কাজ করিস না। কাল থেকে কলেজে যাস।

একবার বিদ্যাসাগর তারাকুমার কবিরত্নের ওপর একটু অন্যায় ব্যবহার করেছিলেন। কিছুদিন পরে জানলেন, যে কারণে তিনি কবিরত্নের ওপর অন্যায় ব্যবহার করেছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তখন তিনি কবিরত্নের বাড়িতে গিয়ে বললেন—তোমার ওপর যে অন্যায় করেছি, কি করলে আমার সে অপরাধ খন্ডন হবে বলো।

কবিরত্ন বললেন—সাগর, আমি তো জানি সাগরের বাষ্প হতেই মেঘ ওঠে, তারই বর্ষণে পৃথিবী শীতল হয়। তোমার হৃদয়ের সেই বেদনার বাষ্পেই আমি শীতল হয়েছি। ভুল তো মানুষেরই হয়ে থাকে—আর ভুল স্বীকার করাতেই জেগে ওঠে সেই ভুল-করা মানুষের হৃদয়ের ছবি। এজন্যই তুমি বিদ্যাসাগর—দয়ার সাগর।

দুজনেরই চোখ আনন্দের অশ্রুতে ভরে উঠলো।

এর কয়েকদিন পরেই একটি মজার ঘটনা ঘটলো। একদিন বিদ্যাসাগর কলেজেরই কাজে এক জায়গায় গেছেন। কাজ সেরে যখন ফিরছেন তখন দেখলেন দশটা বাজতে আর মাত্র কুড়ি পঁচিশ মিনিট বাকী। কলেজ বসে ঠিক দশটায়। বাসায় গিয়ে চান খাওয়া সেরে কিছুতেই দশটার মধ্যে পেঁছতে পারা যাবে না।

বিদ্যাসাগর দেখলেন, তারাকুমার কবিরত্নের ছাত্ররা যে বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করে সেই বাড়িটা কাছেই। তাড়াতাড়ি তিনি সেই বাড়িতে গিয়ে ঢুকলেন। তখন ছেলেদের চান হয়ে গেছে, এবার খেতে বসবে। তিনি একখানা ভিজে কাপড় টেনে নিয়ে নিজের কাপড়-চোপড় ছেড়ে সেটি পরলেন। রাঁধুনির কাছে গিয়ে একটু তেল চেয়ে নিলেন। পাতকুয়ো থেকে জল তুলে দুচার ঘটি মাথায় ঢাললেন চটপট। তারপর কাপড় পরে,

চাদরখানা গায়ে জড়িয়ে একখানা পাতা নিয়ে বসে পড়লেন ছেলেদের পাশে।

ছেলেরা অধ্যক্ষকে দেখে বিস্মিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। কিন্তু বিদ্যাসাগর নির্বিকার। বামুন ঠাকুর তখন সবে মাত্র ছেলেদের পাতে ভাত দিয়ে গেছে। বিদ্যাসাগর এ পাতা থেকে একমুঠো ও পাতা থেকে এক মুঠো —এ ভাবে চার পাঁচ মুঠো ভাত নিজের পাতায় তুললেন। বামুন ঠাকুর তাড়াতাড়ি ছুটে এসে তাঁকে ভাত দিতে চাইলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর বললেন —না না, আর দরকার নেই।

বামুন ঠাকুর তখন ডাল তরকারি দিল। তাড়াতাড়ি খেয়ে বিদ্যাসাগর উঠে হাত-মুখ ধুয়ে ফেললেন। চটি পরে হন হন করে চললেন কলেজের দিকে। ছেলেরা কলেজে গিয়ে অবাক হয়ে দেখলো বিদ্যাসাগর তাদের আগেই তাঁর নির্দিষ্ট আসনে বসে আছেন।

বারো

এ দেশে শিক্ষা-বিস্তারের ক্ষেত্রে বেথুন সাহেবের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। এই সদাশয় ইংরেজ জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন বড়লাটের পরিষদের আইন সদস্য হয়ে এদেশে আসেন। পরে শিক্ষা-পরিষদের সভাপতি হন। সে যুগের কয়েকজন প্রগতিবাদী বাঙালীর সহায়তায় গড়ে তোলেন কলকাতায় একটি বালিকা বিদ্যালয়। সেটিই পরে বেথুন কলেজ ও স্কুল নামে পরিচিত হয়।

বেথুন সাহেবের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের যোগাযোগ বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বেথুন তাঁর প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ে বিদ্যা-সাগরকে সম্পাদক নিযুক্ত করেন। সেজন্য বিদ্যাসাগর কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন না। বেথুন ছিলেন মাতৃভক্ত ও স্ত্রীজাতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল। মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগর তাঁর অন্তরের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগর জানতেন মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে জাতির উন্নতি হবে, তাই তিনি ছিলেন স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে পরম উৎসাহী। এজন্য তাঁকে কম কটূক্তি সহ্য করতে হয় নি। প্রাচীনপন্থী লোকেরা তাঁকে যখন এই ব্যাপারে নানা কথা বলতো, তখন তিনি শাস্ত্রের এই শ্লোকটি তাদের শোনাতেন—কন্যাপেব্যং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।

কিন্তু তখনককার কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাঙালী সমাজ স্ত্রী-শিক্ষাকে কি ঘৃণার চক্ষেই না দেখতো! মেয়েদের স্কুলে যেতে দেখলে বিদ্রূপ করে, ছড়া কাটে, কত অভদ্র আচরণ করে। কেউ বলে—এবার কলির বাকী যা ছিল তা হয়ে গেল! মেয়েগুলো কেতাব ধরলে আর কিছু বাকী থাকবে না। বাবুদের মজলিসে এই নিয়ে রসিকতা চললো—বাপরে বাপ, মেয়েছেলেকে লেখাপড়া শেখালে কি আর রক্ষা আছে!

তবু বিদ্যাসাগর দমলেন না। মেয়েদের লেখাপড়া শেখাও বন্ধ হলো না। বেথুনের প্রচেষ্টা সার্থক হতে চললো। নানা স্থানে গড়ে উঠতে লাগলো বালিকা বিদ্যালয়।

কিন্তু এদেশের জন্য কাজ করতে গিয়েই বেথুন সাহেব প্রাণ দিলেন। তখন বর্ষাকাল। কলকাতা থেকে বারো মাইল দূরে জনাইতে তিনি একটি বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে গেলেন। শুরু হলো প্রবল বৃষ্টি। পথঘাট জলে ও কাদায় ভরে গেল। গাড়ি চলে না। হেঁটেই চললেন, প্রবল

বৃষ্টিতে তাঁর সর্বাঙ্গ ভিজে গেল। বহু কষ্টে দুর্যোগের ভিতর দিয়ে তিনি গিয়ে পেঁছিলেন জনাইতে। কিন্তু সেই রাত্রেই তিনি নিমুনিয়ায় আক্রান্ত হলেন। তার কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁর জীবনপ্রদীপ নিবে গেল।

বেথুন সাহেবের মৃত্যুর সংবাদ যখন বিদ্যাসাগরের কাছে গিয়ে পেঁছিলো, তিনি শিশুর মত কেঁদে উঠলেন।

বেথুনের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাভক্তি ছিল অসীম, তিনি তাঁর একটি প্রতিকৃতি তৈরি করিয়ে নিজের বাড়িতে রেখে দিয়েছিলেন।

বেথুন জীবিত থাকতে তাঁর স্কুলের খরচ নিজেই চালাতেন। তাঁর মৃত্যুর পর স্কুলটি সরকারের হাতে চলে গেল। তার পরেও অনেকদিন বিদ্যাসাগর সেই স্কুল কমিটির সম্পাদক ছিলেন।

এই সময়ে বাংলাদেশে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের দিকে সরকার একটু একটু করে মন দিতে লাগলেন। নানা স্থানে আরও বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে লাগলো। এর মূলে অবশ্য ছিল বাংলার ছোটলাট হ্যালিডের প্রচেষ্টা। এর আগে বিদ্যাসাগর বাংলা মডেল স্কুল খুলে শিক্ষা-বিস্তারের কাজে অনেকটা এগিয়েছিলেন, এবার মেদিনীপুর, বর্ধমান, হুগলী ও নদীয়া জেলার নানা জায়গায় অনেকগুলো বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন। সেইসব স্কুলের জন্য সরকারী সাহায্য চেয়ে বিদ্যাসাগর ইয়ং সাহেবের কাছে চিঠি লিখতে লাগলেন। ইয়ং সাহেব সেই চিঠির নকল পাঠালেন ছোটলাটের কাছে। ছোটলাট ভারত সরকারের কাছে সেই বিষয়ে রিপোর্ট পাঠিয়ে অবিলম্বে সরকারী সাহায্যদান মঞ্জুর করবার জন্য অনুরোধ জানালেন।

কিন্তু ভারত সরকার তখনও ভারতে শিক্ষা প্রসারের উদার নীতি অবলম্বন করেন নি। কাজেই অর্থমঞ্জুর করতে অস্বীকার করলেন। বিদ্যাসাগর এ ব্যাপারে মনে খুবই আঘাত পেলেন। কিন্তু দমলেন না। ভারত সরকারের সিদ্ধান্তের কড়া জবাব দিয়ে পাবলিক ইনস্ট্রাকসনকে চিঠি লিখতে লাগলেন।

একবার গরমের ছুটির সময় বিদ্যাসাগর বাড়িতে আছেন। একদিন রাত্রে তাঁর বাড়িতে ডাকাতি হলো। ডাকাতরা প্রায় সর্বস্ব নিয়ে গেল। বাড়ির সকলেই এবং বিদ্যাসাগরও খিড়কির দরজা দিয়ে পালিয়ে জীবন রক্ষা করলেন।

এত বড় বিপদেও বিদ্যাসাগর কিন্তু বিচলিত হলেন না। পরের দিন যখন থানা থেকে দারোগা ব্যাপারটির তদন্ত করতে এলেন, তখন তিনি ভাই ও বন্ধুদের নিয়ে মহানন্দে কপাটি খেলছেন। দারোগাও বিস্মিত হয়ে গেলেন।

ছুটির পর বিদ্যাসাগর এলেন কলকাতায়। একদিন কোন একটা কাজে দেখা করতে গেলেন ছোটলাট হ্যালিডের সঙ্গে। কথায় কথায় ডাকাতির প্রসঙ্গ উঠলো। হ্যালিডে সব শুনে বললেন—আপুনি তো বড় কাপুরুষ, বাড়িতে ডাকাত পড়লো আর আপনি অমন করে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেলেন?

বিদ্যাসাগর বললেন—এখন তো এই কথা বলছেন। আর এতগুলো ডাকাতের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে যদি মারা পড়তাম, তা হলে হয়তো বলতেন, ইশ লোকটা কি বোকা!

হ্যালিডে আর কোন জবাব দিতে পারলেন না। হাসতে লাগলেন।

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে হ্যালিডের খুব হৃদ্যতা ছিল। হ্যালিডেও ছিলেন বিদ্যাসাগরের গুণে ও কর্মক্ষমতায় মুগ্ধ। লাটভবনে বিদ্যাসাগরের অবাধ গতিবিধি ছিল।

একদিন শহরের অনেক গণ্যমান্য লোক লাটভবনে গিয়েছেন হ্যালিডের সঙ্গে দেখা করতে। অনেকে বহুক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর এসেছেন এই খবর পাওয়া মাত্র ছোটলাট তাঁকে ভিতরে ডেকে পাঠালেন। এতে উপস্থিত ব্যক্তিরা খুবই মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই হ্যালিডে সাহেবকে পরে এর কারণ জিজ্ঞেস করেছিলেন। হ্যালিডে জবাব দিয়েছিলেন—আপনারা আসেন নিজেদের কাজে, আর পণ্ডিত আসেন আমার কাজে। কাজেই তাঁকে যদি আগেই ডেকে থাকি, তাতে কোন দোষ হয়েছে বলে মনে করি না।

হ্যালিডে সাহেব বিদ্যাসাগরকে বলেছিলেন—প্রত্যেক বৃহস্পতি বার নানা বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য আমার কাছে আসবেন। বিদ্যাসাগর তাই যেতেন। পরনে থাকতো নিজস্ব পোশাক—মোটা ধুতি, গায়ে মোটা চাদর আর পায়ে তালতলার চটি।

ছোটলাটের সঙ্গে যাঁরা দেখা করতে যেতেন তাদের প্রায় সবারই পরনে থাকতো সাহেবী পোশাক আর না হয় দামী পোশাক। হ্যালিডে সাহেবের বারবার অনুরোধে বিদ্যাসাগর পেণ্টুলুন, চোগা, চাপকান আর পাগড়ি পরলেন। সেই পোশাক পরে চুপি চুপি শহর পার হয়ে আলিপুরে লাটভবনে বেল্‌ভেডিয়ারে গিয়ে পেঁছলেন। তাঁর ভারী লজ্জা করতে লাগলো।

তিন দিন সেই পোশাক পরে গেলেন। চারদিনের দিন তিনি সাহেবকে বললেন—আপনার সঙ্গে আমার এই শেষ দেখা।

হ্যালিডে সাহেব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কেন পণ্ডিত, কি হয়েছে যে আর দেখা হবে না?

বিদ্যাসাগর হাসতে হাসতে বললেন—এ রকম যন্ত্রণাদায়ক পোশাক পরে সঙ সেজে আসা আমার পক্ষে অসম্ভব। এ কাজ আমার দ্বারা হবে না।

সাহেব কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন তারপর বললেন—পণ্ডিত, এরকম

পোশাক পরে আসতে আপনার যদি খুব কষ্ট হয় তবে আর দরকার নেই। আপনার মনের মত পোশাক পরেই আসবেন।

এর পর থেকে বিদ্যাসাগর তাঁর নিজের বেশভূষা পরেই যেতেন। জাতীয় পোশাকের মর্যাদা তিনি এ ভাবেই রক্ষা করেছিলেন।

হ্যালিডে সাহেবের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের হৃদ্যতা খুবই ছিল, কিন্তু ইয়ং সাহেবের সঙ্গে তাঁর বনিবনা হচ্ছিল না। ইয়ং সাহেব ছিলেন শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর। তিনি তাঁর ক্ষমতা যথেচ্ছ ভাবে প্রয়োগ করতে লাগলেন। বিদ্যাসাগরের কার্যকলাপ ও নীতির তিনি সমালোচনা করতে লাগলেন। তাই বিদ্যাসাগর কাজ করতে গিয়ে পেলেন পদে পদে বাধা। ওদিকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলির ব্যয় নির্বাহের জন্য ভারত সরকার স্থায়ী অর্থ সাহায্য করতে সম্মত হলেন না। তখন বিদ্যাসাগর স্থির করলেন চাকরি ছেড়ে দেবেন।

সংস্কৃত কলেজের উন্নতিকল্পে তিনি যে নূতন নিয়ম পদ্ধতির পরিকল্পনা করেছেন তা তখনো পরিপূর্ণভাবে রূপ লাভ করে নি। এজন্য ডিরেক্টরকে জানালেন আমি কাজ থেকে অবসর নিতে চাই। তিনমাস পরেই পদত্যাগ-পত্র পেশ করবো।

সেই চিঠির প্রতিলিপি তিনি ছোটলাটের কাছেও পাঠিয়ে দিলেন। চিঠি পেয়ে হ্যালিডে সাহেব অবিলম্বে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন। বিদ্যাসাগর গেলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। হ্যালিডে সাহেব তাঁকে আরও অন্ততঃ একটি বছর কাজে বহাল থাকতে অনুরোধ করলেন।

দেখতে দেখতে একটি বছর কেটে গেল। এক বছর পরে পদত্যাগ-পত্র দাখিল করলেন বিদ্যাসাগর।

এ শুধু পদত্যাগ-পত্র নয়; মনের সঞ্চিত আত্ম-অভিমানের জ্বলন্ত প্রকাশ। পদত্যাগ-পত্রে তিনি লিখলেন—'আমি আর যতদিন বাঁচবো সেই সময়টা দেশের ছেলেমেয়েরা যাতে লেখাপড়া শিখে মানুষ হয় তার জন্য চেষ্টা করবো, আর আমার সেই ব্রত আমার মৃত্যুর পরে আমার শ্মশানের ছাইয়ে মিশে সার্থক হবে।'

হ্যালিডে সাহেব ডেকে পাঠালেন ঈশ্বরচন্দ্রকে। বললেন—পণ্ডিত আপনার উদ্দেশ্য অতি মহৎ। যে সব কাজে জড়িয়ে পড়েছেন তাতে আপনার টাকার দরকার অনেক। চাকরি ছেড়ে দিলে যে অর্থাভাবে কষ্ট পাবেন। কাজেই আপনি এখনো বিবেচনা করে দেখুন।

বিদ্যাসাগর বললেন—না, চাকরি আমি ছাড়বোই।

হ্যালিডে আবার অনুরোধ করলেন, কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁর সংকল্পে অটল। পাঁচশো টাকা মাইনের চাকরি ছেড়ে দিলেন বিদ্যাসাগর। বয়স তখন প্রায় চল্লিশ। কিন্তু মনে প্রচুর উদ্যম, শরীরে প্রচুর কর্মক্ষমতা।

এই চাকরি ছাড়ার সংবাদে অনেকেই বিস্মিত হলেন। দুঃখিত হলেন অনেকে। তাঁর বন্ধুরা বলতে লাগলেন—একি করলে বিদ্যাসাগর, এত টাকা মাইনের চাকরি ছেড়ে দিলে?

গাঁয়ে সেকথা পেঁাছতেই লোকে বলতে লাগলো—বামুন এবার নিজের একগুঁয়েমিতে নিজেই মারা পড়লো। আত্মীয়েরা বলে বেড়াতে লাগলো—ঈশ্বরচন্দ্রের এবার ভাতে টান পড়বে।

কিন্তু আত্ম-অভিমানী তেজস্বী পুরুষ বিদ্যাসাগর কারুর কোন কথায় বিচলিত হলেন না।

স্যার জেমস কলভিন তখন কলকাতা সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারক। তিনি ছিলেন বিদ্যাসাগরের হিতাকাঙ্ক্ষী ও বন্ধু। একদিন তিনি বললেন—তুমি আইনের পরীক্ষা দিয়ে ওকালতি করো—বেশ দু পয়সা উপায় করতে পারবে। তা ছাড়া তুমি যে কাজ করতে যাচ্ছ তাতেও অনেক সুবিধা হবে।

সে কথা শুনে বিদ্যাসাগর ভাবলেন ওকালতিই করবেন। এ বিষয়ে পরামর্শ করার জন্য মাঝে মাঝেই দ্বারিকানাথ মিত্রের বাড়িতে যেতে লাগলেন। দ্বারিকানাথ তখন নাম করা উকিল।

সকালে ও সন্ধ্যায় দ্বারিকানাথের বৈঠকখানায় বহু মক্কেলের ভিড় হতো। তাদের সঙ্গে দ্বারিকানাথ যে সমস্ত কথা বলতেন তা শুনে ওকালতির ওপর বিদ্যাসাগরের বিতৃষ্ণা হলো। তিনি দেখলেন, এতে অনেক সময় মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। তা ছাড়া মামলার কাগজপত্র নিয়ে এমন ভাবে ব্যস্ত থাকতে হয় যে অন্য কাজ করার সময় থাকে না। বিদ্যাসাগর ভাবলেন, ওকালতি ব্যবসা করলে পড়াশোনা করবার সময় পাবেন না। আর ওরকম মিথ্যার বেসাতিও তিনি করতে পারবেন না। তাই উকিল হবার বাসনা মন থেকে দূর করে দিলেন।

এখন কি করবেন? কিছুদিন নানা চিন্তা ভাবনার মধ্য দিয়ে দিন কাটালেন।

চাকরিতে অধিষ্ঠিত থাকা কালেই তিনি হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া, মেদিনীপুর, এই চার জায়গায় ঘুরে ঘুরে অনেকগুলি স্কুল খুলেছিলেন। মেয়েদের জন্যও করেছিলেন কয়েকটি স্কুল। সেই স্কুল নিয়েই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতান্তর হয়েছে, চাকরিও ছেড়েছেন সেজন্য। কিন্তু মন থেকে ভাবনা চিন্তা দূর হয়ে যায় নি।

বিদ্যাসাগর দেখলেন ঐ-সব স্কুলে পড়াবার মত বইয়ের খুব অভাব। কি ভাবে ঐ অভাব দূর করা যায় সে বিষয়ে ভাবতে লাগলেন। তারপর নিজেই লেগে গেলেন বই লেখার কাজে। প্রথমেই বুঝলেন ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শুরু করবার ভালো বইয়ের অভাব।

একদিন তিনি একটা স্কুল দেখতে গেলেন। পালকিতে চড়ে যাচ্ছেন তিনি। হঠাৎ তাঁর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। তখনই তাঁর ব্যাগ থেকে কাগজ পেনসিল বের করে লিখতে বসলেন—অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ—ইত্যাদি পনেরোটি স্বরবর্ণ। স্বরবর্ণ লেখা হয়ে গেলে লিখতে শুরু করলেন ব্যঞ্জনবর্ণ—ক খ গ ঘ ঙ। এ ভাবে ঊনচল্লিশটি ব্যঞ্জনবর্ণ লেখা হয়ে গেল।

এবার আর একটি বুদ্ধি তাঁর মাথায় খেললো। অক্ষর চেনাবার জন্য উলটাপালটা করে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণগুলো লিখলেন। এরপর বানান লিখতে আরম্ভ করলেন—কর, খল, ঘট, জল। এই ভাবে অকার, ইকার, ঈকার, উকার, ঊকার, ঋকার, একার, ঐকার, অনুস্বার, বিসর্গ, চন্দ্রবিন্দু সবগুলো দিয়ে সোজা সোজা বানান সাজালেন। ছোট ছোট বাক্য থেকে লিখলেন বড় বড় বাক্য। তারপর শেষের দিকের গোপাল ও রাখাল নামের দুটি ভালো ও মন্দ ছেলের গল্প দিয়ে বই শেষ করলেন। বইখানির নাম দিলেন—'বর্ণপরিচয়'।

বাংলায় লেখাপড়া শুরু করার এমন সুন্দর বই এর আগে আর কখনো হয় নি। আজ পর্যন্তও হয়নি এর চেয়ে ভালো বই।

এই বইখানির জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাঙালীর কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

এরপর বিদ্যাসাগর লিখলেন 'বর্ণপরিচয়' দ্বিতীয় ভাগ। এই বর্ণপরিচয় লেখার পেছনে একটি ইতিহাস আছে। বিদ্যাসাগরের বন্ধু প্যারিচরণ সরকার। দুই বন্ধুতে একদিন পরামর্শ হলো—ছেলে-মেয়েদের পড়বার জন্য বই লিখবেন। বিদ্যাসাগর লিখবেন বাংলা বই—আর প্যারিচরণ লিখবেন ইংরেজী বই। বিদ্যাসাগর একদিন পালকিতে বসে 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ভাগ লিখে ফেলেছেন জেনে প্যারিচরণের মনে জেদ চেপে গেল। তিনিও তাড়াতাড়ি লিখে ফেললেন 'ফার্স্ট বুক'। এ ভাবেই দুই বন্ধুতে মিলে ছেলে-মেয়েদের জন্য কয়েকখানি বাংলা ও ইংরেজী বই লিখে ফেললেন।

রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সহজে সংস্কৃত শেখাবার জন্য বিদ্যাসাগর এর আগে এক রাত্রে লিখেছিলেন 'উপক্রমণিকা'। সেই বইখানা সংশোধিত ও পরিবর্ধিত করে প্রকাশ করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই উপক্রমণিকা ছাত্রদের কাছে অত্যন্ত আদর লাভ করে। বিদ্যাসাগর এরপর লেখেন 'ব্যাকরণ কৌমুদী'। এর ফলেও সংস্কৃত শেখা ছাত্রদের কাছে অতি সহজ হয়ে যায়।

এরপর একটি একটি করে বিদ্যাসাগর অনেকগুলো বই লিখে ফেলেন। জীবন-চরিত, আখ্যান মঞ্জরী, চরিতাবলী পাঠকদের কাছে সমাদৃত হয়। 'মহাভারতের উপক্রমণিকা' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় তত্ত্ববোধিনী

পত্রিকায়। পরে বইয়ের আকারে প্রকাশিত হয়। এরপর বিদ্যাসাগর লেখেন 'সীতার বনবাস'। বইটি অতি আদরের সঙ্গে স্কুলে স্কুলে পড়ানো হতে থাকে।

এরপর বিদ্যাসাগর 'রামের রাজ্যাভিষেক' লেখায় হাত দেন। কিছুটা ছাপাও হয়। বাকীটা ছাপাবার ব্যবস্থা করছেন, এমন সময় একদিন এসে হাজির হলেন শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর হাতে তাঁরই লেখা বইয়ের পাণ্ডুলিপি—'রামের রাজ্যাভিষেক।'

শশিভূষণ পাণ্ডুলিপিটি বিদ্যাসাগরের হাতে দিলেন। বিদ্যাসাগর একটু চমকে উঠে বললেন—একি! তুমিও রামের রাজ্যাভিষেক লিখেছ নাকি!

শশিভূষণ বললেন—হ্যাঁ, পড়ে দেখো।

বিদ্যাসাগর পড়ে দেখলেন। মন্দ হয় নি। এরপর নিজের লেখা বই বন্ধ করে দিলেন। বাকী অংশ আর ছাপলেন না।

'সটীক মেঘদূত' লিখলেন বিদ্যাসাগর। নানা কাজের মধ্যেও লেখার বিরাম নেই। বর্ধমানে গিয়ে রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। সেই রোগশয্যায় শুয়েও লিখতে শুরু করলেন—ভ্রান্তিবিলাস। হাস্য রসাত্মক অতি উপাদেয় বই।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা আগেই বলা দরকার। বিদ্যাসাগর বই তো লিখলেন অনেক। কিন্তু সেগুলো ছাপা চাইতো। বই ছাপা না হলে লোকের চোখে পড়বে কেন। অপরের ছাপাখানায় ছাপতে গেলে খরচ বেশী পড়ে, অসুবিধাও অনেক। তাই তাঁর মনে নিজে ছাপাখানা করার বুদ্ধি জাগলো। এ কাজে তাঁর সহায় হলেন বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার। দুজনে মিলে দুশো টাকায় একটি হাতে চালানো প্রেস কিনলেন। কয়েকজন কম্পোজিটর নিযুক্ত করে প্রেস চালানো হলো। প্রেসের নাম দেওয়া হলো সংস্কৃত প্রেস। বই বিক্রি করবার জন্য একটি বইয়ের দোকানও খোলা হলো। বিদ্যাসাগর তার নাম দিলেন সংস্কৃত বুক ডিপোজিটারী।

আরও একটি কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। বইয়ের ভেতর অনেক লম্বা লম্বা লাইন থাকে। একটানা পড়ে যাওয়া খুবই অসুবিধা জনক। মাঝে মাঝে থামতে হয়, গলার আওয়াজও অন্য রকম করতে হয়। এজন্য বিরাম চিহ্ন এবং আরও অনেক রকম চিহ্নের প্রয়োজন। আগে বাংলা ভাষায় এত সব চিহ্নের ব্যবহার ছিল না। বিদ্যাসাগরই তাঁর বইয়ে প্রথম ঐ সব চিহ্নের প্রচলন করেন। তাতে ভাষা সুন্দর হয়েছে, পড়তেও সহজ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাই বলে গেছেন—"বিদ্যাসাগর একাকার সমভূম বাংলা রচনার মধ্যে এই ছেদ চিহ্নের ব্যবহার করিয়া বাংলা ভাষায় নবযুগের প্রবর্তন করিয়াছেন। ইহাতে যাহা জড় ছিল, তাহা সচল হইয়াছে।"

তেরো

অসীম গুণের সাগর বিদ্যাসাগর এবার মন দিলেন সমাজ সংস্কারে।

বৃদ্ধ অধ্যাপক শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতির বিধবা তরুণী-বধূর চোখে জল দেখে তাঁর চোখে যে জল এসেছিল, সেই তপ্তধারা তখনো শুকোয় নি। সেই তপ্ত ধারার প্রবাহ থেকেই একদিন হয়েছিল বিধবা বিবাহের আন্দোলনের সূচনা।

কিন্তু তারও একটি ইতিহাস আছে। যুগ মানুষকে যেমন সৃষ্টি করে, তেমনি মহামানবরা সৃষ্টি করে যান যুগ। তাই পৃথিবীতে যুগে যুগে এমন মহাপুরুষের সৃষ্টি হয়েছে যাঁরা ধ্বংসের হাত থেকে জাতিকে বাঁচিয়েছেন, নূতন সংস্কৃতির পত্তন করেছেন বা নূতন প্রেরণায় জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

যুগকে নিয়ে মানুষ। মানুষকে নিয়ে যুগ। তাই বাংলার ইতিহাসে সিপাহী বিদ্রোহ, হিন্দুপেট্রিয়ট ও হরিশ্চন্দ্রের আবির্ভাব, নীল বিদ্রোহ, সোমপ্রকাশের অভ্যুদয়, বিধবা বিবাহ আন্দোলন দেশের বুকে এক একটি জ্বলন্ত স্বাক্ষর রেখে গেছে।

রাজা রামমোহন রায় এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন করে গেলেন। আর করে গেলেন সতীদাহ প্রথা নিবারণ। এতে হিন্দুবিধবারা জীবন্ত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেল কিন্তু তাদের ভবিষ্যৎ রইলো অনিশ্চিত।

সতীদাহ প্রথা যখন নিষিদ্ধ হলো তখন ঈশ্বরচন্দ্র মাত্র সাত বছরের বালক। বিধবাদের সম্বন্ধে কিছু চিন্তা করার ক্ষমতা তাঁর হয় নি। এর আগে কৃষ্ণনগরের মহারাজ শ্রীশচন্দ্র এবং কলকাতার কয়েকজন উদার হৃদয় ব্যক্তি বিধবা-বিবাহের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা সফল হতে পারেন নি।

বিদ্যাসাগরই এগিয়ে এলেন এই সংস্কার-মুক্তির বিপ্লবের পথে।

বিধবাদের বিয়ে দিতে হবে। তাদের দুঃখময় জীবনের অবসান ঘটাতে হবে। বিদ্যাসাগরের মনে এই সংকল্প দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে লাগলো।

বীরসিংহ গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্রের এক বাল্য সহচরী ছিল। ছোটবেলায় একসঙ্গে খেলা করতেন। ঈশ্বরচন্দ্র যখন কলাকাতায় আসেন তখন মেয়েটির বিয়ে হয়। কিন্তু বিয়ের কিছুদিন পরেই সে বিধবা হয়ে বাপের বাড়িতে চলে আসে। ঈশ্বরচন্দ্র ছুটির সময় দেশে গিয়ে একদিন জানতে পারলেন মেয়েটি সেদিন কিছু খায় নি।

—কেন খায় নি? জিজ্ঞেস করলেন বিদ্যাসাগর।

হিন্দু বিধবাদের একাদশীর দিন খেতে নেই।

–সে কথা শুনে কেঁদে ফেললেন ঈশ্বরচন্দ্র। এ কি রকম নিয়ম? এ আবার কোন্ শাস্ত্রের বিধান!

ঈশ্বরচন্দ্রের তখন মাত্র তেরো-চোদ্দ বছর বয়স। তাঁর মনে সেই যে দুঃখের স্মৃতি গাঁথা হয়ে রইলো তা আর কোনদিন ঘুচলো না।

বড় হয়ে বিদ্যাসাগরের মনে সেই সংকল্পই দৃঢ় হতে লাগলো—বিধবার দুঃখ ঘোচাতে হবে।

কিন্তু অন্ধ কুসংস্কারে আবদ্ধ হিন্দু সমাজ। সমাজপতিদের বিধিনিষেধ, পণ্ডিতদের রক্তচক্ষু—সব কিছু ডিঙিয়ে অভাগিনী বিধবাদের দুঃখ মোচন করা সম্ভব নয়। বিদ্যাসাগর তাই শাস্ত্রের বিধান খুঁজতে লাগলেন। যদি কোন শাস্ত্রে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা দিয়েই তিনি সমাজপতি ও পণ্ডিতদের জব্দ করে কাজ উদ্ধার করবেন স্থির করলেন।

শাস্ত্রের পর শাস্ত্র ঘাঁটতে লাগলেন বিদ্যাসাগর। কিন্তু কোথাও কোন বিধান পান না, পান না কোন ইঙ্গিত। তবু তাঁর মনে উৎসাহের ঘাটতি নেই। আহার নিদ্রা ছেড়ে শাস্ত্রের মধ্যে তিনি তন্ময় হয়ে থাকেন।

একদিন রাত্রিবেলায় বিদ্যাসাগর রাশীকৃত শাস্ত্রীয় পুঁথিপত্র নিয়ে বসেছেন। এমন সময় রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের কোন দিকে খেয়াল নেই। তিনি বইয়ের পর বইয়ের পাতা উলটিয়েই চলেছেন। ভৃত্য এসে গড়গড়াতে কলকে দিয়ে যাচ্ছে। বিদ্যাসাগর গড়গড়া টানছেন আর পুঁথির পর পুঁথি পড়ছেন।

পরাশর-সংহিতার পাতা উলটিয়ে পড়তে পড়তে হঠাৎ বিদ্যাসাগর চিৎকার করে বলে উঠলেন—পেয়েছি, পেয়েছি!

রাজকৃষ্ণ বললেন— কি পেয়েছেন?

দাঁড়িয়ে উঠে আনন্দে বিদ্যাসাগর পায়চারি করতে লাগলেন। আনন্দে উদ্ভাসিত তাঁর চোখ মুখ। বললেন—কি পেয়েছি শুনবে রাজকৃষ্ণ? শোন তবে—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরণ্যো বিধীয়তে।

রাজকৃষ্ণ অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইলেন বিদ্যাসাগরের মুখের দিকে। বিদ্যাসাগর বললেন—বুঝলে রাজকৃষ্ণ, এই হলো অকাট্য প্রমাণ।

—কিসের?

—বিধবা বিবাহের। স্বামী যদি দুশ্চরিত্র হয়, মারা যায়, সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করে, ক্লীব হয়, কিংবা ধর্মত্যাগ করে—এই পাঁচটি কারণে নারী অন্য পতি গ্রহণ করতে পারে। শাস্ত্রেই এর সমর্থন রয়েছে। আমি বিধবা বিবাহের প্রচলন করবো।

সে কথা শুনে রাজকৃষ্ণ চমকে উঠলেন। কি ভয়ংকর কথা বলছেন বিদ্যাসাগর! এ যে বিরাট সামাজিক বিপ্লবের আভাস!

শাস্ত্রের বিধান পেয়ে গেছেন, এখন আর ভয় কি? বিদ্যাসাগর কাগজ কলম নিয়ে লিখতে বসলেন। রাত জেগে লিখে ফেললেন বিরাট একটি প্রবন্ধ।

পরদিন সকালে অক্ষয়কুমার দত্ত আসতেই তাঁর হাতে এক তাড়া কাগজ দিয়ে বললেন—এই নাও অক্ষয়, তোমার তত্ত্ববোধিনীর জন্য কিছু খোরাক দিলাম।

অক্ষয়কুমার হাতে নিয়ে দেখলেন, বিদ্যাসাগরের লেখা প্রবন্ধ—'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা?'

বিদ্যাসাগরের লেখা, কাজেই ছাপতে দেরি হলো না। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হতেই পাঠক সমাজে তা নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি হলো। পরে সেটি প্রকাশিত হলো পুস্তিকার আকারে।

হইচই পড়ে গেল সারা শহরে। নিস্তরঙ্গ সমাজে যেন প্রবল ঝঞ্ঝার ঢেউ উঠলো। পণ্ডিতসমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন, প্রাচীন সমাজের ভিত যেন নড়ে উঠলো।

শাস্ত্রের বিধান পেয়েছেন বিদ্যাসাগর, বুকে সাহস জেগেছে! এখন বাবা-মায়ের অনুমতি ও তাঁদের আশীর্বাদ পেলেই তিনি ঝাঁপিয়ে পড়বেন এই দুঃসাহসিক আন্দোলনে। বাইরের কোন বাধাকেই তিনি বাধা বলে মনে করবেন না।

বিদ্যাসাগর চলে গেলেন বীরসিংহ গ্রামে। কি আশ্চর্য যোগাযোগ! খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করছেন, মা ভগবতী দেবী বসেছেন খেতে; হঠাৎ গাঁয়ের এক বাড়ি থেকে কান্নার শব্দ ভেসে এল। নারীকণ্ঠের কান্না!

ভগবতী দেবীর খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। চমকে উঠলেন বিদ্যাসাগর। কি হলো মা?

ভগবতী দেবী বললেন—ঐ বাড়ির বউটির স্বামী পরশুদিন মারা গেছে বাবা। আহা, ন-বছরের মেয়ে অকালে বিধবা হলো!

বিদ্যাসাগর বললেন—মা, আমি বিধবা বিবাহের প্রচলন করবো।

ভগবতী দেবীর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললেন—করবি? তা হলে খুবই ভালো হয়, বাবা। এই সব বাল-বিধবাদের দুঃখ যে আমি সইতে পারি না। কিন্তু শাস্ত্রের যে কঠোর বিধান!

বিদ্যাসাগর বললেন—আমি শাস্ত্রের বিধান পেয়ে গেছি মা। বিধবা বিবাহে কোন বাধা নেই। এখন তোমার অনুমতি পেলেই আমি কাজে এগিয়ে যেতে পারি। তুমি অনুমতি দাও মা। তুমি আশীর্বাদ করো।

ভগবতী দেবী বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—আমি অনুমতি দিলাম। ঘরে

ঘরে কত বিধবা নীরবে চোখের জল ফেলছে, তারা তোকে আশীর্বাদ করবে। আমারও আশীর্বাদ রইলো বাবা।

বিদ্যাসাগর ঠাকুরদাসের কাছে কথাটি তুললেন। ঠাকুরদাস বললেন—কাজটি খুবই ভালো। কিন্তু বর্তমানে সমাজের যারা শাসক—সেই সমাজপতিরা বাধা দেবে।

বিদ্যাসাগর বললেন—বাধা পাবো তা জানি। তবু শাস্ত্রের বিধান দেখিয়ে আর বিধবাদের দুর্দশার কথা বুঝিয়ে বলে জনমত গড়ে তুলবো।

ঠাকুরদাস বললেন—যদি পারিস ভালো। আমার এতে কোন আপত্তি নেই। ভালো কাজে ভগবান তোর সহায় থাকবেন।

বাবা ও মার সম্মতি ও আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে বিদ্যাসাগর ফিরে এলেন কলকাতায়। বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলেন। বন্ধুরা অনেকেই উৎসাহ দিলেন। কিন্তু বাধা পেলেন প্রবীণ পণ্ডিতদের কাছে।

শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব তখন কলকাতার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। সমাজে এবং রাজদরবারে তাঁর বিশেষ প্রভাব। বিদ্যাসাগর আনন্দকৃষ্ণ বসুর কাছে গিয়ে একদিন বললেন—মহারাজ যদি এই বিধবা বিবাহের ব্যাপারে সহায় হন তবে আমার এ কাজে খুবই সুবিধা হবে। তুমি তাঁকে একটু বলো না।

আনন্দকৃষ্ণ বললেন—দাদামশাইকে এ কথা বলতে আমার সংকোচ হয়। তুমি নিজে একটি পত্র লিখে তোমার একখানা বই তাঁর কাছে পাঠিয়ে দাও।

বিদ্যাসাগর তাই করলেন। চিঠি ও বই পাওয়ার পর রাধাকান্ত দেব একদিন ডেকে পাঠালেন বিদ্যাসাগরকে। তাঁকে বললেন—পণ্ডিত, তোমার বই পড়লাম; তুমি যে শাস্ত্রীয় যুক্তি দেখিয়েছ তা সুন্দর। তবে আমি শাস্ত্রের কি বুঝি, এ বিষয়ে মতামত দেওয়া আমার সাধ্যাতীত।

বিদ্যাসাগর বললেন—আপনি সমাজপতি, অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি, মতামত দেওয়া আপনার পক্ষে সাধ্যাতীত হবে কেন?

রাধাকান্ত দেব হেসে বললেন—এ নিয়ে পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনা করাই ভালো। তুমি যদি রাজী থাকো, তা হলে দিন ঠিক করে একদিন পণ্ডিতদের ডাকি।

বিদ্যাসাগর রাজী হলেন। নির্দিষ্ট দিনে শোভাবাজার রাজবাড়িতে পণ্ডিতদের সভা বসলো। রীতিমত বিচারসভা। বিচারের বিষয় হলো—বিধবা বিবাহ।

বিদ্যাসাগর সভার মাঝখানে বসলেন। পরনে থান ধুতি, গায়ে সাদা চাদর। চোখে মুখে দিব্য জ্যোতি, কোন ভয় বা মালিন্যের চিহ্ন তাতে নেই। পণ্ডিতদের প্রত্যেকের হাতেই একখানা করে বিদ্যাসাগরের লেখা বই —'বিধবা বিবাহ হওয়া উচিত কিনা।'



অন্তিমে বিদ্যাসাগর

পণ্ডিতরা তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানালেন। হিন্দু সমাজ রসাতলে যাবে বলে ভবিষ্যদ্‌বাণী করলেন। শাস্ত্র থেকে আওড়ালেন নানা শ্লোক। বিদ্যাসাগর শাস্ত্রের যুক্তি দিয়েই পণ্ডিতদের যুক্তি খণ্ডন করলেন। কিন্তু কোনো মীমাংসা হলো না। তবে বিদ্যাসাগরের তর্কপদ্ধতিতে ও সরস বাক্য-প্রয়োগে খুশী হয়ে রাধাকান্ত তাঁকে একখানা দামী শাল উপহার দিলেন।

কিন্তু এতে হিতে বিপরীত হলো। সমাজপতিরা মনে করলেন, রাধাকান্ত দেব বোধ হয় বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী। তাই অনেকে এসে তাঁকে বললেন—আপনি কি সর্বনাশ করলেন! আপনি কি এই পাপ প্রথার প্রচলন করতে চান?

রাধাকান্ত দেব বললেন—আমি শাস্ত্রের কি বুঝি? বিদ্যাসাগরের তর্ক করার ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে আমি শাল উপহার দিয়েছিলাম। যদি পণ্ডিতরা চান তবে আর একদিন বিচার-সভা হোক।

কিছুদিন পরেই শোভাবাজার রাজবাড়িতে আবার একটি বিচার-সভা বসলো। সেদিন সভায় উপস্থিত হলেন বাংলার পণ্ডিত সমাজের শিরোমণি নবদ্বীপের ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন। সেদিনও তর্কের ঝড় উঠলো। কিন্তু কোন মীমাংসা হলো না। রাধাকান্ত দেব বিদ্যারত্ন মহাশয়কে একখানি শাল উপহার দিলেন। বিদ্যাসাগর বুঝতে পারলেন শোভাবাজার রাজের কাছ থেকে এই ব্যাপারে কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না। কারণ সেদিন ব্রজনাথ বিদ্যারত্নকে কেন্দ্র করেই বেশী পরিমাণে বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠলো।

বিদ্যাসাগর সেদিন ক্ষুব্ধ অন্তরে বিচার-সভা থেকে চলে এলেন। মনে আঘাত পেলেন কিন্তু বিচলিত হলেন না। কেউ যদি তাঁর পাশে না দাঁড়ায় তিনি একাই এই নিয়ে আন্দোলন করবেন।

বিচার-সভার পর বিদ্যাসাগর আর একটি ব্যাপার লক্ষ্য করলেন। এই নিয়ে চারদিকে আলোড়ন যেন বেড়ে গেল। লোকের মুখে মুখে আলোচনা —বিধবা বিবাহ।

বিদ্যাসাগর আগে যে দু হাজার বই ছাপিয়েছিলেন তা নিঃশেষ হয়ে গেছে। আবার তিন হাজার বই ছাপানো হলো। তা-ও হুহু করে বিক্রি হতে লাগলো।

নিস্তরঙ্গ সমাজে উঠলো বিপ্লবের ঢেউ।

কলকাতার শ্যামাচরণ দাস ছিলেন জাতিতে কর্মকার। তিনি তাঁর বালবিধবা মেয়ের বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তাই নিয়ে বড় বড় পণ্ডিতদের দরবারেও গিয়েছিলেন। মুক্তারাম তর্কবাগীশ, কাশীনাথ তর্কালঙ্কার, রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত প্রভৃতি বিখ্যাত শাস্ত্রবিদ্‌রা তাঁর মেয়ের বিয়ের বিধান

দিয়েছিলেন। কিন্তু কি কারণে পণ্ডিতদের মত পরিবর্তন হলো। সেজন্য শ্যামাচরণ তাঁর মেয়ের বিয়ে দিতে পারলেন না। বিদ্যাসাগর বুঝতে পারলেন পণ্ডিতদের মনে দুর্বলতা কোথায়। সত্য জেনেও তাঁরা প্রচলিত আচারের বিরুদ্ধে যেতে সাহস পান না। তাঁদের মনে সাহস নেই—ভাবের উদারতা নেই।

এই ঘটনাটি ঘটে বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে পুস্তিকা প্রকাশ হবারও কিছুকাল আগে। শ্যামাচরণ দাসকে পণ্ডিতরা যে বিধান দিয়েছিলেন তাতে কয়েকজন অভিজ্ঞ পণ্ডিতদের স্বাক্ষরও ছিল। কিন্তু আশ্চর্য, তাঁরাই পরে বিধবা বিবাহের ঘোর বিরোধী হয়ে ওঠেন। শ্যামাচরণ পণ্ডিতদের রচিত ব্যবস্থাপত্রের জোরে মেয়ের বিয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু তিনিও লোকনিন্দা ও পণ্ডিতদের বিরোধিতার ভয়ে পিছিয়ে গেলেন। এই সমস্ত কথা বিবেচনা করে বিদ্যাসাগর বুঝলেন মানুষের মনে সৎসাহসের অভাব। ঘুমন্ত মানুষকে সচেতন করে তুলতে হবে—দুর্বল সমাজের বুকে শক্তির সঞ্চার করতে হবে।

চারদিকে সমালোচনা, প্রতিবাদের ঝড়—তবু বিদ্যাসাগর তাঁর সংকল্পে অটুট রইলেন। বের করলেন দ্বিতীয় খণ্ড বই। এই বইয়ে তিনি জোর দিয়ে বললেন—বিধবা বিবাহ ষোল আনা শাস্ত্রসম্মত।

সেই বইও যখন প্রচুর বিক্রি হতে লাগলো তখন পণ্ডিত সমাজ আর স্থির থাকতে পারলেন না। তাঁরা প্রকাশ্যেই বিদ্যাসাগরের নিন্দা করে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর তাতেও দমলেন না। তাঁর মনের জেদ বাড়তে লাগলো। তিনি বললেন—আমি বিধবা বিবাহ প্রচলন করবোই—তার জন্য যদি আমাকে সর্বস্বান্ত হতে হয়, তাও হবো।

একদিন তিনি বর্ধমান থেকে কলকাতা ফিরছিলেন। তিনি রেলের যে কামরায় উঠেছিলেন, পাণ্ডুয়া স্টেশন থেকে সেই কামরায় একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত উঠলেন। ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগরকে চিনতেন না। তিনি উঠেই নানা কথার মধ্যে বিধবা বিবাহের আলোচনা তুললেন। তখন চারদিকে এই নিয়েই আলোচনা চলতো।

ব্রাহ্মণ বললেন—গেল, দেশটা একেবারে রসাতলে গেল। কোথাকার কে বিদ্যাসাগর, বামুনের ঘরে কালাপাহাড়—বিধবা বিয়ের হুজুগ এনেছে।

বিদ্যাসাগরের সম্বন্ধে অসংখ্য গালমন্দ করতে লাগলেন সেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। বিদ্যাসাগর নির্বিকার ভাবে সব কিছু শুনলেন, কোন কথাই বললেন না। হুগলী স্টেশনে গাড়ি ভিড়লো। ব্রাহ্মণ সেখানেই নামবেন। কিন্তু তার আগেই তিনি দেখতে পেলেন কয়েকজন বিশিষ্ট লোক বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করার জন্য সেই কামরার দিকে আসছেন। মুহূর্তেই তিনি

বুঝতে পারলেন, যাঁর সাক্ষাতে এত সব কথা বলেছেন, তিনি বিদ্যাসাগর। হঠাৎ তাঁর কি হলো, মাথা ঘুরে প্ল্যাটফর্মে পড়ে গেলেন। তা দেখে বিদ্যাসাগর ছুটে গেলেন, চোখে মুখে জল দিয়ে সুস্থ করে তুললেন ব্রাহ্মণকে। গন্তব্যস্থানে পোঁছবার জন্য কিছু অর্থও দিলেন।

প্রাচীন সমাজ ও পণ্ডিত সমাজের কাছ থেকে কোন সমর্থনই বিদ্যাসাগর পেলেন না। শুধু পেলেন নিন্দা ও অপবাদ। সংবাদপত্রও তাঁর বিরূপ সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠলো।

ধুধু মরুভূমির মধ্যেও যেন মরূদ্যানের সন্ধান পেলেন বিদ্যাসাগর। ইংরেজী শিক্ষিত যুবকরা তাঁকে সমর্থন করতে লাগলো।

বিদ্যাসাগর আশ্চর্য হয়ে গেলেন, যিনি ছিলেন তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষী, সেই রাধাকান্ত দেবই প্রভাবশালী সমাজপতি রূপে বিধবা বিবাহ আন্দোলনে করলেন বাধা সৃষ্টি। তাঁর অর্থে পুষ্ট হয়ে বহু বিখ্যাত পণ্ডিত বিধবা বিবাহকে অযৌক্তিক এবং ধর্মবিরোধী বলে প্রচার করতে লাগলেন। বলতে লাগলেন, বিদ্যাসাগর স্লেচ্ছ! বিদ্যাসাগর অনাচারী! বিদ্যাসাগর সমাজের শত্রু!

তবে বিদ্যাসাগর তিনজনকে পেলেন যাঁরা এই বিরুদ্ধ সমালোচনার মাঝেও এসে দাঁড়ালেন তাঁর পাশে। তাঁরা হলেন—পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি, তারানাথ বাচস্পতি ও গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

বিদ্যাসাগর দেখলেন, বিধবা বিবাহের ব্যাপার নিয়ে চারদিকে যে রকম আলোড়ন চলছে, রাজপুরুষদেরও এই ব্যাপারে অবহিত করা দরকার। তা না হলে এই কাজে আরও বাধা আসবে। তিনি তাঁর দ্বিতীয় পুস্তিকার ইংরেজী অনুবাদ করে তার প্রচার করতে ইচ্ছা করলেন। এই ব্যাপারে তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করলেন আনন্দকৃষ্ণ বসু আর প্রকাশের ব্যাপারে সহায়তা করলেন প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী।

ইংরেজী অনুবাদ প্রচার হওয়ার পর তার সুফল দেখা গেল। এ দেশীয় ইংরেজী কর্মচারীরা বুঝতে পারলেন হিন্দু বিধবাদের বড় কষ্ট, তাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। তাঁদের অন্তরে সহানুভূতি জাগলো।

বিদ্যাসাগর বিশিষ্ট রাজকর্মচারীদের সঙ্গে দেখা করলেন, অনেক পরামর্শও করলেন তাঁদের সঙ্গে। তাঁরা জানালেন এই ব্যাপারে তাঁদের সহানুভূতির অভাব ঘটবে না। তবে বিষয়টি আইনসিদ্ধ করে নেওয়া দরকার।

বিদ্যাসাগর বুঝলেন শুধু শাস্ত্রের জোরেই কাজ সিদ্ধ হবে না, আইনের জোর থাকা চাই। তখন মনস্থ করলেন, এক হাজার লোকের স্বাক্ষরসহ একটি আবেদন-পত্র ব্যবস্থাপক সভায় পাঠাবেন। আবেদন-পত্র লেখা হয়ে গেল, কিন্তু তাতে সই করতে অনেকেরই আপত্তি। কেউ কেউ বললেন—এ ব্যাপারে আমার সমর্থন আছে, কিন্তু সই করতে পারবো না।

বিদ্যাসাগর তাতেও দমলেন না। লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে লাগলেন। সবচেয়ে ভরসার কথা হলো, সেই আবেদনপত্রে প্রথম স্বাক্ষর করলেন উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। তখন অনেকেই সই করতে সাহস পেলেন। দেখতে দেখতে এক হাজার সই যোগাড় হয়ে গেল। আইনের একটি পাণ্ডুলিপি সহ বিদ্যাসাগর সেই আবেদনপত্র পাঠিয়ে দিলেন ব্যবস্থাপক সভায়।

বিদ্যাসাগর দোরে দোরে ঘুরছেন স্বাক্ষর সংগ্রহের জন্য, এ দৃশ্যে মানুষের মনে পরিবর্তন এলো। সাড়া পড়ে গেল সারা দেশে। বর্ধমানের মহারাজা বিধবা বিবাহ সমর্থন করে নিজেই একটি আবেদনপত্র পাঠিয়ে দিলেন। তারপর নবদ্বীপের মহারাজা, ময়মনসিংহের জমিদার, ঢাকার জমিদার এবং অন্যান্য বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সমবেত ভাবে আলাদা আলাদা আবেদনপত্র পাঠাতে লাগলেন। এ ভাবে প্রায় পঁচিশ হাজার লোক বিধবা বিবাহের আইনের আবেদন জানালো।

আশ্চর্য এক আলোড়নে জেগে উঠতে লাগলো যেন সমস্ত দেশ। বিরুদ্ধবাদীরা এবার শঙ্কিত হয়ে উঠলো। হায়, দেশ বুঝি রসাতলে যায়। তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি সবই বুঝি ধূলিসাৎ হয়। হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরতে লাগলো তারা। কেউ কেউ বিদ্যাসাগরের প্রাণ নাশ করবারও চেষ্টা করতে লাগলো।

রাস্তায় মাঝে মাঝেই বিরুদ্ধবাদীর দল তাঁকে ঘিরে ধরতো, নানা প্রশ্নে তাঁকে বিব্রত করে তুলতো, গালাগালি দিতেও ছাড়তো না। অনেকে প্রকাশ্যে ভয়ও দেখাতো। পথে ঘাটে সাধারণভাবে চলাফেরা করাও তাঁর পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ালো।

ঠাকুরদাসের কানে সে কথা গেল। তাই বলে ছেলেকে তিনি নিরুৎসাহিত করলেন না। বরং বললেন ধরবার আগে ভাবা ও বুঝা উচিত ছিল, যখন বুঝে ধরেছ, তখন ছেড় না। কথায় ও কাজে যেন মিল থাকে।

শ্রীমন্ত ছিল গাঁয়ের বিখ্যাত লাঠিয়াল। তিনি তাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন। বলে দিলেন, বাড়ির বাইরে যাবার সময় যেন সে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে থাকে।

একদিন বিদ্যাসাগর রাত্রিবেলায় কোন একটা কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন। তখন বেশ একটু রাত হয়েছে। ঠনঠনে কালীবাড়ির কাছে আসতেই একটু থমকে দাঁড়ালেন। জায়গাটা অন্ধকার। লক্ষ্য করে দেখলেন কয়েকটি গুণ্ডা তাঁর দিকেই যেন এগিয়ে আসছে। শ্রীমন্ত তখন একটু পিছিয়ে পড়েছিল। বিদ্যাসাগর হাঁক দিয়ে ডাকলেন—ওরে ছিরে, আছিস তো?

পেছন থেকে শ্রীমন্ত গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল—হ্যা কর্তা, আছি। ভয় নেই, আগিয়ে চলুন।

ঐ কথা শুনেই গুণ্ডার দল অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে গলির মধ্যে পালিয়ে গেল। বিদ্যাসাগর বাড়ি ফিরে এলেন।

পরদিন তিনি খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন কে তাঁকে মারবার জন্য লোক পাঠিয়েছিল। তখন তিনি সেই ভদ্রলোকের বাড়ি গিয়ে হাজির হলেন। ভদ্রলোক তখন ঐ গুন্ডাদের সঙ্গে বসেই আলোচনা করছিলেন। তাঁকে দেখে সকলেই থমকে গেল। বিদ্যাসাগর ভদ্রলোকের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন—শুনলাম আপনি নাকি আমাকে মেরে ফেলবার জন্য গুন্ডা লাগিয়েছেন—কাল সন্ধ্যার পরে তাদের সঙ্গে আমার শুভদৃষ্টিও হয়ে গেছে। আমাকে মেরে ফেলবার জন্য কেন আপনি এত কষ্ট করছেন? তাই আপনার কাছে এলাম—এই খানেই সে-কাজটা সেরে ফেলুন। কাজ হাসিল করে আমার মৃতদেহটা ফেলে দিন কোন জায়গায়। কেউ জানবে না—শুনবে না।

বিদ্যাসাগরের কথা শুনে সকলেই বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইলো। লজ্জায় ভদ্রলোকের মাথা ধীরে ধীরে নীচু হয়ে গেল। কোন কথাই আর তিনি বলতে পারলেন না।

এমনি করে বিদ্যাসাগর জীবনের ভয়কে তুচ্ছ করে এগিয়ে চলতে লাগলেন। জয় না হয় মৃত্যু। একবার যখন এগিয়েছেন—কিছুতেই তিনি পিছিয়ে যাবেন না। পিতাও তাঁকে সেই কথা বলেছেন, নিজের মনেও সেই সংকল্প।

দুর্জয় বাধা যেন ধীরে ধীরে অপসারিত হতে লাগলো। লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগলো বিধবা বিবাহের কথা। পথে ঘাটে, অন্দর মহলে, বৈঠকখানায়, হাটে বাজারে এক কথা—বিধবা বিবাহ আর বিদ্যাসাগর।

এই নিয়ে কত গান রচনা হতে লাগলো, কত ছড়া লেখা হলো। লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগলো সেই ছড়া ও গান। বাংলার পথঘাট মুখর হয়ে উঠলো—

> সুখে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে।
> সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে॥

চাষী লাঙল চালায়, তন্তুবায় তাঁত বোনে, গাড়োয়ান গাড়ি চালায়—সবার মুখে এই গান। শান্তিপুরের শাড়ির পাড়েও এই গান লেখা হলো। দাশু রায় ছড়া বাঁধলেন—

> বিধবার বিবাহ কথা
> কলির প্রধান স্থান কলিকাতা,
> নগরে উঠেছে অতি রব—

গুপ্ত কবি ঈশ্বর গুপ্তও চুপ করে বসে রইলেন না। তাঁর সরস ব্যঙ্গময়ী লেখনী থেকে বেরিয়ে এলো কবিতা—

বাধিয়াছে দলাদলি, লাগিয়াছে গোল।
বিধবার বিয়ে হবে বাজিয়াছে ঢোল।

বাংলা দেশে যেন এক নূতন যুগের সৃষ্টি হলো। যারা এতকাল সমাজের ভয়ে দূরে ছিল, তারাও এগিয়ে এসে বিধবা বিবাহের সমর্থন জানাতে লাগলো। উমেশচন্দ্র মিত্র লিখলেন 'বিধবা বিবাহ' নাটক। প্রথমে সিঁদুর পটির গোপাল মল্লিকের বাড়ি তারপর পাইকপাড়ার রাজবাড়িতে সেই নাটকের অভিনয় হলো। এই অভিনয়ের যাঁরা উদ্যোক্তা তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন। তিনি তখন বয়সে তরুণ। বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টায় তিনি ছিলেন একজন উৎসাহী সমর্থক। ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা বিদ্যাসাগরের এই আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য অনেকভাবে সাহায্য করতে লাগলেন। 'বিধবা বিবাহ' নাটকের অভিনয়ে যাঁরা অংশ গ্রহণ করতেন তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী। বিদ্যাসাগর কয়েকবার সেই অভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন। যতবারই অভিনয় দেখছেন, দেখতে দেখতে তাঁর চোখ জলে ভরে উঠেছে।

চোদ্দ

প্রায় পঁচিশ হাজার লোকের স্বাক্ষরিত আবেদনপত্র নিষ্ফল হলো না। কিছুদিন পরেই ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য মিঃ জে· পি· গ্রাণ্ট বিধবা বিবাহ আইনের একটি খসড়া সভায় উত্থাপন করলেন। আলোচনা করার সময় তিনি বললেন—এই আইন প্রচলিত হলে কারুর বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ওপর আঘাত আসবে না, কিন্তু এক শ্রেণীর লোক যে আর এক শ্রেণীর ওপর অত্যাচার উৎপীড়ন করে তা বন্ধ হবে।

মিঃ গ্রাণ্টের প্রস্তাব সমর্থন করলেন অপর সদস্য স্যার জেমস কলভিন। আইনের খসড়া সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হলো।

বিরুদ্ধবাদীরা হিন্দুধর্ম রক্ষার ধোঁয়া তুলে মহারাজ রাধাকান্ত দেবকে শিখণ্ডী রেখে শেষবারের মত এর বিরোধিতা করলেন। প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোকের স্বাক্ষর যোগাড় করে তাঁরাও পাঠিয়ে দিলেন এক আবেদনপত্র।

কিন্তু এত করেও সত্যের কণ্ঠরোধ করা সম্ভব হলো না। ১৮৫৬ সালের জুলাই মাসে আইন পাস হয়ে গেল।

বিরোধীরা জব্দ হয়ে গেল, জয় হলো বিদ্যাসাগরের।

নবদ্বীপের মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নিজের হাতে চিঠি লিখে গ্রাণ্ট সাহেবকে অভিনন্দন জানালেন। বিদ্যাসাগরের প্রশংসায় চারদিক্ মুখর হয়ে উঠলো।

বিধবা বিবাহ আইন পাস হলো সত্য, একটি জিনিস তাতে স্বীকৃত হলো না। যে বিধবার বিয়ে হবে, মৃত স্বামীর বিষয়-সম্পত্তিতে তার কোন অধিকার থাকবে না। না থাক, তবু আইনতঃ সিদ্ধ—এতেই আন্দোলনকারীরা খুশী।

এবার বিদ্যাসাগর নামলেন কার্যক্ষেত্রে। বিধবা বিবাহের উদ্যোগ আয়োজন করতে লাগলেন। উপযুক্ত পাত্র পাত্রীও পাওয়া গেল। মদনমোহন তর্কালঙ্কার হলেন বিয়ের ঘটক। পাত্র যশোরের প্রসিদ্ধ কথক রামধন তর্কবাগীশের পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। পাত্রী নদীয়া জেলার পলাশডাঙা গ্রামের ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশ বছরের বিধবা কন্যা কালীমতি দেবী। ব্রহ্মানন্দ তখন জীবিত ছিলেন না। তাঁর বিধবা স্ত্রী লক্ষ্মীমণি দেবী কিশোরী কন্যার ভবিষ্যৎ ভেবে বিধবার বিয়ে দিতে সাহস করলেন। তাঁর সাহস দেখে সকলেই ধন্য ধন্য করে উঠলো।

কিন্তু গ্রামের বাড়িতে বিধবা-বিবাহের অনুষ্ঠান করতে অনেকেই সাহসী হলেন না। তখন স্থান ঠিক করা হলো—কলকাতা সুকিয়া স্ট্রীটের রাজকৃষ্ণ

বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি। মদনমোহন তর্কালঙ্কার কালীমতি ও তার মাকে কলকাতায় নিয়ে এলেন। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে তাদের রাখা হলো। পাত্র শ্রীশচন্দ্রকে রাখা হলো রামগোপাল ঘোষের বাড়িতে।

লক্ষ্মীমণি দেবীর নামে লাল কালিতে ছাপা নিমন্ত্রণ পত্র বরপক্ষ, কন্যাপক্ষ এবং অন্যান্য বহু ব্যক্তিকে পাঠানো হলো। বিদ্যাসাগর নিজে গিয়ে তাঁর বন্ধুবান্ধব এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করলেন।

দেখতে দেখতে বিয়ের দিন ঘনিয়ে এল। সন্ধ্যা হতে না হতেই নিমন্ত্রিত পণ্ডিতমণ্ডলী এবং শহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়িতে সমবেত হতে লাগলেন। বিয়ে দেখবার জন্য অনাহত বহু লোকও বাড়ির সামনে এসে জমা হতে লাগলো। পুরমহিলা কন্যাকে সাজিয়ে বরাগমনের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। বর দেখবার জন্য সুকিয়া স্ট্রীট ও তার আশপাশের রাস্তায় অসংখ্য লোক জমে গেল। শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় বিদ্যাসাগর পুলিসের সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। বিরুদ্ধবাদীরা হয়তো বিয়ে পণ্ড করবার জন্য চেষ্টা করবে, পুলিস কর্তৃপক্ষও সেই আশঙ্কা করে প্রচুর পুলিসের ব্যবস্থা করলেন।

লগ্নের সময় ঘনিয়ে এলো। বর ও বরযাত্রীরা এসে উপস্থিত হলেন। কি বিরাট শোভাযাত্রা! রাজপথ লোকে লোকারণ্য। ভিড় ঠেলে পালকিও এগোতে পারে না। পালকির সঙ্গে আছেন রামগোপাল ঘোষ, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, হরচন্দ্র ঘোষ, দ্বারকানাথ মিত্র, শিবচন্দ্র দেব প্রভৃতি বিদ্যাসাগরের অনুরাগী বন্ধুগণ। ভিড় ঠেলে আনন্দ কোলাহলের মধ্যে বর ও বরযাত্রীরা বিয়েবাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

বিয়ের অনুষ্ঠান শুরু হলো। অনুষ্ঠানে উপস্থিত পণ্ডিতদের মধ্যে ছিলেন জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ, তারানাথ তর্কবাচস্পতি এবং আরো অনেকে। গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা দিগম্বর মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি।

কন্যার বিধবা মাতা লক্ষ্মীমণি দেবী মেয়েকে সম্প্রদান করলেন। বিয়ের সমস্ত খরচ বহন করলেন বিদ্যাসাগর।

মহাসমারোহে বাংলাদেশের প্রথম বিধবা বিবাহ সম্পন্ন হলো। বিদ্যাসাগরের বহুদিনের স্বপ্ন হলো সার্থক। বাংলা ১২৬৩ সালের ২৩শে অগ্রহায়ণ তারিখটি নব যুগের সূচনা হিসাবে স্মরণীয় হয়ে রইলো।

ব্রাহ্মসমাজের অনেকেই বিয়ের বাসরে উপস্থিত ছিলেন। তবে বিশেষ দুজন বন্ধু ছিলেন অনুপস্থিত। একজন অক্ষয়কুমার দত্ত আর একজন রাজা রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ রায়। বিদ্যাসাগর রাজা রামমোহনকে সমাজসংস্কারকদের নেতৃস্থানীয় বলে শ্রদ্ধা করতেন, সেই

হিসাবে রমাপ্রসাদের সাহায্য ও সহানুভূতি পাবেন বলে তিনি আশা করেছিলেন। বিয়েতে তাঁকে নিমন্ত্রণ করবার জন্য বিদ্যাসাগর নিজে গিয়েছিলেন তাঁর বাড়িতে। রমাপ্রসাদ বলেছিলেন, আমি ভিতরে ভিতরে আছিই তো, বিয়েতে নাই বা গেলাম।

সেকথা শুনে রাগে ও ঘৃণায় বিদ্যাসাগরের শরীর রিরি করে উঠেছিল। দেওয়ালে টাঙানো রাজা রামমোহন রায়ের ছবির দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলেছিলেন—ওটা রেখেছ কেন? ফেলে দাও—ফেলে দাও।

আর এক মুহূর্তও বিদ্যাসাগর সেই ঘরে দাঁড়ান নি।

তবু তিনি ভেবেছিলেন রমাপ্রসাদ বিয়েতে উপস্থিত হবেন। অক্ষয়কুমার দত্ত তখন অসুস্থ ছিলেন বলে আসতে পারেন নি। কিন্তু রমাপ্রসাদ না আসায় বিদ্যাসাগর খুবই মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। তা ছাড়াও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি কথা দিয়েও বিবাহ বাসরে উপস্থিত হন নি। তাতেও বিদ্যাসাগরের মনে দুঃখের সঞ্চার হয়েছিল।

বিধবা বিবাহ হয়ে যাবার পর সংস্কারবিরোধী ব্যক্তিরা প্রচার করতে লাগল—এই কাজ মোটেই হিন্দু ধর্মসংগত হয় নি। কয়েকটি পত্রিকাও এই সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করলো।

তবু বিদ্যাসাগর দমলেন না। নিজে খরচ বহন করে আরও কয়েকটি বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা করলেন। ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগেও কয়েকটি বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠিত হলো। বিদ্যাসাগর শুধু বিধবার বিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হতেন না, দম্পতি যাতে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে তার দিকেও লক্ষ্য রাখতেন। সেজন্যও তাঁর বহু অর্থব্যয় হতো।

তবে একথা সত্য, বহু যুবক বিধবা বিবাহে মনে অনুপ্রেরণা লাভ করতে লাগলো। সেটাই হলো এই আন্দোলনের সার্থকতা।

কলকাতা হাইকোর্টের উকিল শ্রীনাথ দাসের ছেলে উপেন্দ্রনাথ দাস স্ত্রীর মৃত্যুর পর একটি বিধবাকে বিয়ে করলো। বিয়েতে পিতার সম্মতি ছিল না। তাই বিয়ের পর ছেলেকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

উপেন্দ্রনাথের স্বভাব অবশ্য খুব ভাল ছিল না। সেজন্য বিদ্যাসাগর তার ওপর বিরক্ত ছিলেন। কিছুদিন পর উপেন্দ্রনাথ অর্থাভাবে খুবই অসুবিধায় পড়লো। গিয়ে আশ্রয় নিল শিবনাথ শাস্ত্রীর বাড়িতে। সেখানে গিয়ে সে গুরুতর ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লো। তার বাঁচবার কোন আশা রইলো না।

উপেন্দ্রনাথ তখন শিবনাথ শাস্ত্রীকে বললো—আমি আর বোধহয় বাঁচবো না। যদি বাবার সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দিতে পার তবে বড় ভাল হয়।

শিবনাথ বিদ্যাসাগরের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সব কথা জানিয়ে বললেন—আপনি ছাড়া আর কারুর দ্বারা একাজ হবে না।

পরদিন ভোরবেলায় বিদ্যাসাগর শ্রীনাথ দাসের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলেন। গিয়েই বললেন—শ্রীনাথ, তোমার গাড়ি জুততে বলো দেখি, তোমাকে এক জায়গায় যেতে হবে।

শ্রীনাথবাবু জিজ্ঞেস করলেন—কোন্ জায়গায়?

বিদ্যাসাগর বললেন—আঃ, চল না, রাস্তায় বলবো।

দুজনে গাড়িতে চড়ে কিছুটা পথ আসার পর বিদ্যাসাগর বললেন—কোথায় নিয়ে যাচ্ছি জানো? তোমার ছেলে উপেন কাশী থেকে এসে এক বন্ধুর বাড়িতে উঠেছে। তার ব্যায়রাম বড় শক্ত, বাঁচে কিনা সন্দেহ। সে তোমাকে দেখতে চেয়েছে, তাই তোমাকে নিতে এসেছি।

সে কথা শুনে শ্রীনাথবাবু রেগে উঠলেন। বললেন—কোচম্যান, গাড়ি ফেরাও।

তখন বিদ্যাসাগর বললেন—গাড়ি থামাও, আমি নামবো।

কোচম্যান গাড়ি থামালে বিদ্যাসাগর যেই নামতে যাবেন তখন শ্রীনাথবাবু তাঁর হাত ধরে বললেন—একি, তুমি নামছো কেন?

বিদ্যাসাগর বললেন—আমায় ছাড়, ছাড়! তোমার সঙ্গে আমার এই শেষ বন্ধুতা। ছেলে মৃত্যুশয্যায় পড়ে বাবাকে দেখতে চেয়েছে, তুমি কিরূপ বাপ যে এমন সময়েও দেখা দিতে চাও না!

এ কথা শুনে শ্রীনাথবাবুর মন পরিবর্তন হলো এবং কোচম্যানকে গাড়ি চালাতে বললেন। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে এলেন শিবনাথ শাস্ত্রীর বাড়িতে। পিতা পুত্রে মিলন হলো। শ্রীনাথবাবু ছেলেকে দেখে চলে গেলেন। বিদ্যাসাগর তখনো দাঁড়িয়ে রইলেন উপেনের বিছানার পাশে। তার কানাকড়িও সম্বল নেই শুনে বিদ্যাসাগরের চোখে জল এলো। শিবনাথের হাতে দেড়শো টাকা দিয়ে বললেন—দেখিস্, এর বউ ছেলে যেন কষ্ট না পায়। টাকার অভাব হলে আমাকে বলিস। এই বলে বিদ্যাসাগর বিদায় নিলেন।

বিধবা বিবাহের ব্যাপারে যাঁরা বিদ্যাসাগরকে আন্তরিক ভাবে সাহায্য করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন রাজনারায়ণ বসু। কারণ তিনি তাঁর জেঠতুতো ভাই দুর্গামোহন বসুকে এবং আপন ভাই মনোমোহন বসুকে বিধবা বিবাহ করতে সম্মত করিয়েছিলেন। এ জন্য বোড়ালের অর্থাৎ তাঁর গাঁয়ের লোকেরা তাঁকে মারবার ভয় পর্যন্ত দেখিয়েছিল।

বিধবা বিবাহ আন্দোলনের আর একজন উৎসাহী সমর্থক ছিলেন কোন্নগরের শিবচন্দ্র দেব। তিনি ছিলেন হিন্দু কলেজের একজন অন্যতম প্রতিভাবান ছাত্র। তিনি কলকাতায় অনুষ্ঠিত প্রথম বিধবা বিবাহে যোগদান করেছিলেন বলে গ্রামের লোকেরা তাঁকে সমাজচ্যুত করেছিল।

শিবনাথ শাস্ত্রীও বিদ্যাসাগরের প্রচলিত প্রথম বিধবা বিবাহের অনুষ্ঠানে

দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি তরুণ ছাত্র। কিছুকাল পর তাঁর এক সহপাঠী যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের স্ত্রী হঠাৎ মারা যায়। তখন অনেক বিপত্নীক যুবকদের মনেই বিধবা বিবাহের অনুপ্রেরণা জেগে উঠেছিল। শিবনাথ যোগেন্দ্রনাথকে পরামর্শ দিলেন বিধবা বিবাহ করবার জন্য। যোগেন্দ্রনাথ রাজী হলেন। একটি মনোমত পাত্রীও পাওয়া গেল। তখন তাঁরা গেলেন বিদ্যাসাগরের কাছে। বিদ্যাসাগর সব কিছু ব্যবস্থা করে দিলেন। নিমন্ত্রিতদের খাওয়ার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করলেন তিনি নিজে। কনেকে অনেক যৌতুকও দিলেন।

বিদ্যাসাগর দিনের পর দিন অক্লান্ত চেষ্টা করে এক শতেরও বেশী বিধবার বিয়ে দিলেন। এই ব্যাপারে বাধাও কম পান নি। কিন্তু নিজের মনের জোরে এবং কিছুসংখ্যক বন্ধুর সহায়তায় তিনি সেই বাধা অতিক্রম করেছেন। কিন্তু সেজন্য তাঁকে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে। বহু টাকা তাঁকে দেনা করতে হয়েছে। শোনা যায় কোন কোন বিয়েতে তিনি দশ হাজার টাকাও খরচ করেছেন। বিয়েতে জাঁকজমকও কম করা হতো না, কন্যাকে বহুমূল্য বস্ত্রালংকারে ভূষিত করা হতো, কিন্তু নিজে থাকতেন অতি সাধারণ ধুতি চাদরের পোশাকে। কেউ যেন অপবাদ দিতে না পারে হেলাফেলা ভাবে বিধবার বিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাই বিয়ের খরচে কোন কার্পণ্য করতেন না।

এত করেও কিন্তু বিধবা বিবাহের ব্যাপারে বিদ্যাসাগরকে খুব মনস্তাপ ভোগ করতে হতো। গোড়ার দিকে অনেক ধনী ব্যক্তিরাই তাঁকে সাহায্য করবেন বলে আশা দিয়েছিলেন কিন্তু পরে তাঁদের উৎসাহ কমে গিয়েছিল এবং সাহায্যও বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তখন সমস্ত দায়িত্ব এবং খরচের ভার বিদ্যাসাগরের ওপরেই এসে পড়েছিল। এজন্য তিনি প্রায় সর্বস্বান্ত হতে বসলেন।

বিধবা বিবাহের আন্দোলন নিয়ে যখন সারা বাংলা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে, তখন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো সিপাহী বিদ্রোহের আগুন। দেশে তখন অস্বস্তিকর অবস্থা, কাজেই আন্দোলন স্থগিত রইলো। এক বছরেরও কিছু বেশীদিন পর যখন দেশে একটা স্থিরতার ভাব এলো তখন আবার বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহের কাজে হাত দিলেন।

আর ঠিক সেই সময়েই তাঁর জীবনে ঘটলো বিপর্যয়। তিনি ইনস্‌পেক্টর ও সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের কাজে ইস্তফা দিলেন। পাঁচশো টাকা মাইনের চাকরি ছেড়ে দিয়ে বেছে নিলেন দুঃখময় জীবনের পথ। তাঁর কাছে যে সম্ভ্রমই বড়, চাকরি বড় নয়।

সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন সংস্কৃত কলেজের একজন মেধাবী ছাত্র। সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষার পরীক্ষায় কৃতিত্ব অর্জন করে তিনি বৃত্তি পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন বধির। কাজকর্মের কোন সুবিধা করতে না

পেরে বিদ্যাসাগরের শরণাপন্ন হলেন। বিদ্যাসাগর ভাবলেন তাঁর জন্য কি করা যায়।

জনসাধারণকে শিক্ষিত ও সচেতন করে তুলতে হলে একটি বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ করা দরকার, এ কথা বিদ্যাসাগর অনেকদিন থেকেই উপলব্ধি করেছিলেন। এ বিষয়ে তিনি তাঁর সহপাঠী দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সঙ্গে অনেক পরামর্শও করেছিলেন। এবার সারদাপ্রসাদকে কাজে লাগাবার জন্য ও তাঁকে সাহায্য করবার জন্য পত্রিকাটি প্রকাশের সংকল্প করলেন।

১৮৫৮ সালের ১৫ই নভেম্বর। প্রকাশিত হলো নূতন সাপ্তাহিক পত্রিকা। প্রতি সোমবার প্রকাশিত হতো বলে নাম দেওয়া হলো 'সোমপ্রকাশ'।

এর কিছুদিন পরেই সারদাপ্রসাদ বর্ধমান মহারাজার বাড়িতে একটি চাকরি পেয়ে গেলেন। মহাভারত অনুবাদের কাজ। অবশ্য এই চাকরি পাওয়ার ব্যাপারে বিদ্যাসাগরেরও হাত ছিল। সারদাপ্রসাদ চাকরি পেয়ে বর্ধমান চলে গেলেন। তখন বিদ্যাসাগর দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের উপরেই দিলেন 'সোমপ্রকাশ'-এর সম্পূর্ণ ভার। বিদ্যাভূষণকে সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী করে দেওয়া হলো।

এতকাল যে সব পত্রিকা ছিল তাতে থাকতো ধর্মের কথা আর সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা। কিন্তু দ্বারকানাথ বুঝলেন, যুগের পরিবর্তন হচ্ছে, কাগজে নূতন কিছু দিতে হবে। তাই শুরু করলেন রাজনীতির আলোচনা। এর আগেও অবশ্য কোন কোন কাগজে রাজনীতি নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা হতো, কিন্তু এমন সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে নয়। তাই 'সোমপ্রকাশ' কিছুদিনের মধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। বহু লোক 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার জন্য সোমবারের প্রতীক্ষায় থাকতো। এর মূলে ছিল বিদ্যাসাগর ও বিদ্যাভূষণের অক্লান্ত প্রচেষ্টা।

১৮৭৮ সালে ভার্নাকুলার প্রেস আইন চালু হলো। লাহোরের সংবাদ-দাতা প্রেরিত একটি সংবাদ ছাপা হওয়ায় সরকার দ্বারকানাথের কাছ থেকে মুচলেকা ও এক হাজার টাকা জামিন দাবি করলেন। দ্বারকানাথ মুচলেকা ও টাকা কোনটাই দিতে রাজী হলেন না। কাগজ বন্ধ হয়ে গেল। চারদিকে এই নিয়ে কত হইচই! অসংখ্য পাঠকদের পক্ষ থেকে পত্রিকা প্রকাশের অনুমতি দেবার জন্য সরকারকে অনুরোধ করা হলো। বিলেতের পার্লামেণ্টেও এই নিয়ে আলোচনা উঠলো। সরকার তখন পত্রিকা প্রকাশের অনুমতি দিলেন।

সোমপ্রকাশ আবার প্রকাশিত হলো, কিন্তু তখন তার হাত বদল হয়ে গেছে। আগের মত জনপ্রিয়তা আর সে অর্জন করতে পারলো না। ফলে কিছুদিন পরই চিরকালের জন্য 'সোমপ্রকাশ' বন্ধ হয়ে গেল।

১৮৬১ সালের ১৪ই জুন। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র

মুখোপাধ্যায় মারা গেলেন। সে সংবাদ শুনে বিদ্যাসাগরের মন বেদনা ও হতাশায় ভরে উঠলো। অগ্নিময়ী রচনার প্রভাবে হরিশচন্দ্র নীলকর সাহেবদের অত্যাচার প্রতিরোধ করেছিলেন, সে কথা বাংলাদেশের লোক কখনো ভুলতে পারবে না। দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে, স্কুলে না পড়েও শিক্ষিত হয়ে যে ব্যক্তি উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন, তাঁর মৃত্যু দেশের পক্ষে অপূরণীয় ক্ষতি।

হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর 'হিন্দু পেট্রিয়ট' বন্ধ হয়ে গেল, প্রেসও উঠে যাবার যোগাড় হলো। হরিশচন্দ্রের পরিবারবর্গ হয়ে পড়লো নিঃসহায়। বিদ্যাসাগর তখন কালীপ্রসন্ন সিংহের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁকে বললেন—হরিশচন্দ্রের প্রেস ও কাগজটা তুমি কিনে নাও। তাহলে দেশের একটি গৌরব রক্ষা হবে এবং একটি অসহায় পরিবারও রক্ষা পাবে।

কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগরের প্রতি কৃতজ্ঞ ও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তা ছাড়া নিজেও ছিলেন দানে মুক্তহস্ত ও উদারহৃদয়। মাইকেল মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ কাব্য' ও দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' তাঁরই অর্থ-সাহায্যে প্রকাশিত হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের অনুরোধে তিনি পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে প্রেস ও পত্রিকার স্বত্ব কিনে নিলেন। একটি অসহায় পরিবার বেঁচে গেল, একটি দেশ-হিতৈষী পত্রিকাও রক্ষা পেল।

পনেরো

সিপাহী বিদ্রোহের অবসানের পর দেশে আবার শান্তি ফিরে এসেছে। সেই সময়ে প্রকাশিত হলো মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ বধ কাব্য'। বইটি প্রকাশিত হওয়ার পরই কলকাতা শহরে এক আলোড়নের সৃষ্টি হলো। বহু ব্যক্তি বইটির প্রশংসা করলেন, অনেকে আবার নিন্দাও করতে লাগলেন। মাইকেলকে ব্যংগ করবার জন্য প্রকাশিত হলো 'ছুছুন্দরী বধ কাব্য'।

এক শ্রেণীর শিক্ষিত সমাজ যদিও মেঘনাদ বধ কাব্যের দিকে অবজ্ঞায় মুখ ফিরালেন, কিন্তু বিদ্যাসাগর, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি ব্যক্তিরা তাকে সমাদরে গ্রহণ করলেন। কবিকে অভিনন্দন জানালেন বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনের জন্য।

অসাধারণ প্রতিভাশালী মধুসূদন বাংলা কাব্য সাহিত্যে সত্যি এক নবযুগের সৃষ্টি করলেন। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী ছিলেন তাঁর প্রতি বিরূপ। উচ্ছৃংখল প্রকৃতির জন্য পিতামাতার স্নেহ থেকে তিনি বঞ্চিত হলেন। স্বধর্ম পরিত্যাগ করে খ্রীষ্ট ধর্ম অবলম্বন করায় হলেন সমাজচ্যুত।

মধুসূদন বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নিয়ে ব্যারিস্টারি পড়বার জন্য বিলেত গেলেন। সংগে তাঁর বিদেশিনী স্ত্রী ও সন্তান। অনেকেই কথা দিয়েছিলেন নিয়মিত তাঁকে টাকা পাঠাবেন। নিজের জমাজমির ভার যার ওপর দিয়ে গিয়েছিলেন তারও মাঝে মাঝে টাকা পাঠাবার কথা ছিল। কিন্তু কেউ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন না। তখন খুবই বিপদে পড়লেন মধুসূদন।

১৮৬৪ সাল। তখন তিনি ফরাসী দেশের ভার্সাই নগরে। টাকার চিন্তায় চারদিক অন্ধকার দেখছেন। বন্ধুবান্ধবদের কাছে ও যাদের কাছে টাকা পাবেন তাদের কাছে বারবার চিঠি লিখেও কোন সাড়া পাচ্ছেন না। যে হোটেলে এসে উঠেছেন সেখানে অনেক টাকা বাকী। টাকা দিতে না পারলে তাঁর খাওয়াই শুধু বন্ধ হয়ে যাবে না, তাঁকে জেলেও যেতে হতে পারে।

আকাশ পাতাল চিন্তা করতে করতে তাঁর মনে পড়লো বিদ্যাসাগরের কথা। তখন তাঁকে সব কথা জানিয়ে চিঠি লিখলেন। চিঠির ভাষা অতি করুণ। মধুসূদন লিখলেন—"আমি অর্থাভাবে বিদেশের কোন কারাগারে যাইতেছি, আর আমার স্ত্রী ও সন্তানেরা কোন অনাথ আশ্রমে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইল। যে দুরবস্থার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি, ইহা হইতে উদ্ধার করিতে

আপনি একমাত্র সুহৃদ।...আপনার করুণা ভিন্ন বাঁচিবার অন্য কোন সম্ভাবনা নাই।"

সেই চিঠি পড়ে বিদ্যাসাগরের দু চোখ জলে ভরে উঠলো! তিনি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কারণ সেই সময়ে তাঁর নিজেরই খুব অর্থাভাব চলছে।

কিন্তু তাই বলে বসে থাকলে তো চলবে না। বাংলার নবযুগের কবি মধুসূদনকে বাঁচাতে হবে। টাকার জন্য অনেক জায়গায় ঘুরলেন। মধুসূদনের বন্ধুদেরও ঐ চিঠি দেখিয়ে টাকা পাঠাতে বললেন। কিন্তু কেউ সেরূপ উৎসাহ দেখাল না। অথচ এদিকে দেরি করলেও চলবে না। দেড় হাজার টাকা ধার করে বিদ্যাসাগর পরের ডাকেই পাঠিয়ে দিলেন।

ওদিকে টাকার জন্য আদালতে লোক বসে আছে। টাকা দিতে না পারলে হয়তো তাঁকে জেলে যেতে হবে। মধুসূদন লোকদের বলেছেন—ভারতবর্ষের ডাক আসবার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করুন, আমি যাঁকে টাকার জন্য লিখেছি, তিনি চিঠি পেয়েই তার পরের ডাকে নিশ্চয়ই টাকা পাঠিয়েছেন—হয়তো আজই পাবো।

এই রকম কথাবার্তা হচ্ছে, সেই সময়েই ডাকঘরের লোক গিয়ে উপস্থিত হলো। মধুসূদনের হাতে দিল ভারতের দেড়হাজার টাকার বিনিময়ে ফরাসী দেশের ২৪৯০ ফ্রাঙ্ক।

মধুসূদন চরম সংকট থেকে রক্ষা পেলেন।

কিছুদিন পরের কথা। মাইকেল দেশে ফিরে আসবেন। বিদ্যাসাগর একটি বাড়ি ভাড়া করে সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখলেন। মধুসূদন কলকাতায় ফিরে যাতে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারেন সেজন্য কোন ব্যবস্থার ত্রুটি করলেন না। কিন্তু দুঃখের বিষয় মাইকেল সেই বাড়িতে ওঠেন নি। উঠেছিলেন এক সাহেবী হোটেলে। সে খবর শুনে বিদ্যাসাগর মনে খুবই ব্যথা পেয়েছিলেন।

ঋণজালে জর্জরিত বিদ্যাসাগর। তবু তাঁর কাজের বিরাম ছিল না। দেশে দেশে স্কুল প্রতিষ্ঠা করবেন—শিক্ষা বিস্তার করবেন এ যেন তাঁর চিরকালের স্বপ্ন।

এ প্রসঙ্গে মিস কার্পেণ্টারের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা খুবই প্রয়োজন। এই বিদুষী ইংরেজ মহিলা এদেশে এসে তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন নারী-শিক্ষা বিস্তারের কাজে।

বেথুন সাহেবের মৃত্যুর পর বিদ্যাসাগরের ওপর যখন বেথুন বিদ্যালয়ের

ভার পড়লো তখন তিনি খুবই বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। বিদ্যালয় চালাবার জন্য বিদ্যাসাগরকে খুব পরিশ্রম করতে হয়েছিল। সেই সময়ে গভর্নর জেনারেল ছিলেন লর্ড ক্যানিং। তাঁর স্ত্রী লেডি ক্যানিং বিদ্যাসাগরকে খুব প্রীতির চক্ষে দেখতেন। তাই স্কুল পরিচালনায় তিনি অনেক সাহায্য করেছিলেন। তাঁদেরই যুক্ত প্রচেষ্টায় বেথুন স্কুল পরবর্তী কালে বেথুন কলেজে পরিণত হয়।

সেই সময়ে মিস কার্পেন্টারের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পরিচয় ঘটে। পরিচয়ের পর শুরু হয় আত্মীয়তা। অনেক সময়ে দুজনে একসঙ্গে কোন কোন জায়গায় স্কুল পরিদর্শনে যাতায়াত করতেন।

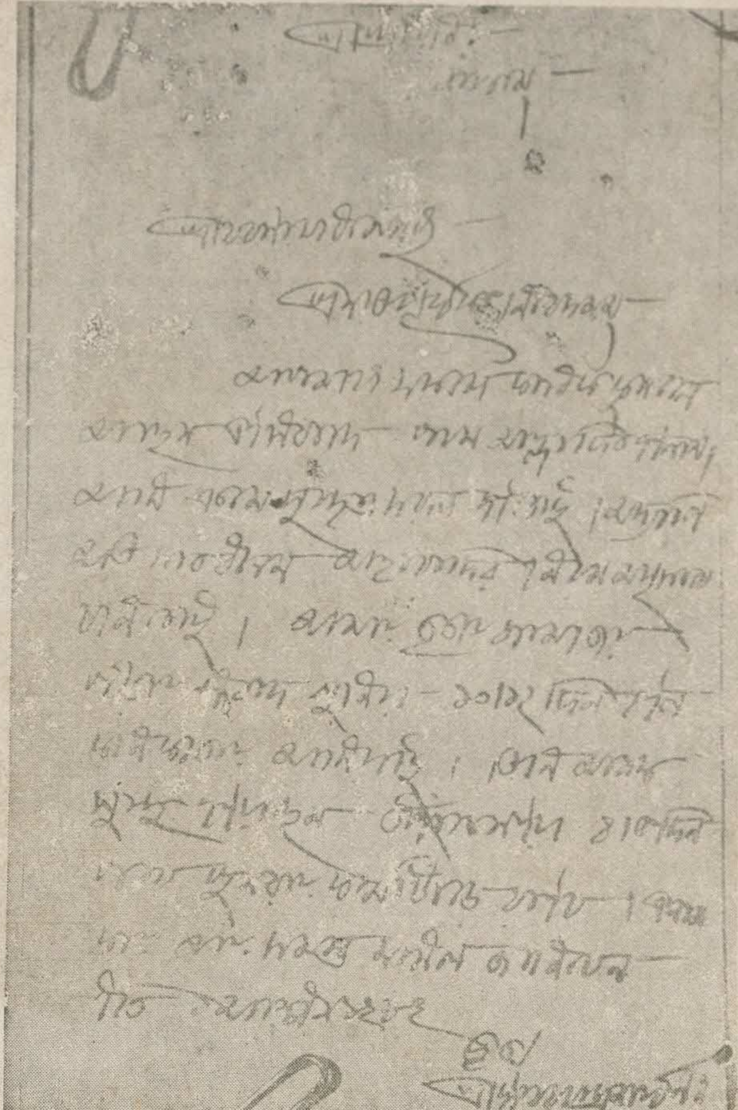
একদিন কার্পেন্টার গেলেন উত্তরপাড়া বালিকা বিদ্যালয় দেখতে। কথা হলো বিদ্যাসাগরও তাঁর সঙ্গী হবেন। একটা বগি গাড়িতে চড়ে বিদ্যাসাগর বালি স্টেশন থেকে উত্তরপাড়ার দিকে যাচ্ছিলেন। ঘোড়াটা একটা মোড় ফেরবার সময় হঠাৎ গাড়িখানা উলটে গেল। বিদ্যাসাগর গাড়ি থেকে ছিটকে পড়ে গেলেন একটা খানার ধারে। পড়েই তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। একটু পরেই সেখানে পৌঁছলো মিস কার্পেন্টারের গাড়ি। কার্পেন্টার তাড়াতাড়ি গিয়ে বিদ্যাসাগরকে খানা থেকে টেনে তুললেন। কোলে তুলে নিয়ে নিজের রুমাল দিয়ে বাতাস করতে লাগলেন।

এই আঘাতের ফলে বিদ্যাসাগরের শরীর ভেঙে পড়ে—স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যায়। আগেকার স্বাস্থ্য আর কখনো ফিরে তিনি পান নি।

কবি নবীনচন্দ্র সেন তখন বয়সে তরুণ। ১৮৬৫ সালে তিনি এফ· এ· পাস করলেন। কলকাতায় এসে ভরতি হলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে। বি· এ· পরীক্ষার তখন মাত্র তিন মাস বাকী, সেই সময়ে অকস্মাৎ তাঁর পিতৃবিয়োগ হলো। নবীনচন্দ্র পড়লেন বিষম বিপদে, তাঁর পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হলো। অবশেষে বিদ্যাসাগরের শরণাপন্ন হলেন। প্রণাম করতে গিয়ে কয়েক ফোঁটা চোখের জল পড়লো বিদ্যাসাগরের পায়ে। তাতে বিদ্যাসাগর খুবই ব্যথিত হলেন। জানতে চাইলেন তরুণ কবির বিপদের কাহিনী। সব কিছু শুনে তিনি বললেন—তুমি কাতর হয়ো না। আমিও একদিন তোমার মত দুঃখী ছিলাম।

বিদ্যাসাগরের সাহায্য পেয়ে নবীনচন্দ্র বিপদমুক্ত হলেন। কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ পরবর্তী কালে তিনি তাঁর 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্য ঈশ্বরচন্দ্রকে উৎসর্গ করেছিলেন। নবীনচন্দ্রের দৃষ্টিতে এই মনীষী ছিলেন মানব-ঈশ্বর ...নর-নারায়ণ।

বিদ্যাসাগর ধার করে টাকা পাঠিয়ে মাইকেলকে বিদেশে বিপদ থেকে



পিতা ঠাকুরদাসকে লেখা বিদ্যাসাগরের পত্র

উদ্ধার করেছিলেন। মাইকেল বিদ্যাসাগরকে আখ্যা দিয়েছিলেন 'কর্ণার সিন্ধু'। কিন্তু টাকা তিনি শোধ করতে পারেন নি। তখন বিদ্যাসাগর তাঁর ছাপাখানা সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারীর তিন ভাগের এক ভাগ বিক্রি করে পাওনাদারের টাকা শোধ করে দিলেন।

ক্রমে ক্রমে প্রেসের কাজ কমে গেল। নিজে দেখাশোনা করতে পারতেন না। নানা গোলমাল চলতে লাগলো। এজন্য বিরক্ত হয়ে বিদ্যাসাগর প্রেসের স্বত্ব ছেড়ে দেবার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু যত টাকা চান, কেউ তা দিতে রাজী হলো না। তাঁর এক আত্মীয় ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় বললেন—আমার ওপর যদি ভার দেন তা হলে আপনার হয়েই আমি প্রেসটা চালাতে পারি।

একটু দাম কমিয়ে দিলেই বিদ্যাসাগর অনেক টাকা পেতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করলেন না। ব্রজবাবুকে প্রেসটা দান করে দিলেন। পরদিন সকালবেলা এক ব্যক্তি টাকা নিয়ে এসে হাজির হলেন—প্রেসটা তিনি কিনবেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর বললেন—বিশ হাজার টাকা দাম দিলেও আর বিক্রি করতে পারি না, ওটা যে দান করেছি।

বিধবা বিবাহের প্রচলন করেই কিন্তু বিদ্যাসাগর নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকেন নি। বাংলা দেশের কুলীনদের সমাজে বহুবিবাহ প্রথা তখন দুষ্টক্ষতের মত বিরাজ করছিল। এই কুপ্রথা রহিত করবার জন্য বহুলোকের স্বাক্ষরিত এক আবেদনপত্র সরকারের দরবারে পেশ করলেন। সেই আবেদনের যখন কোন সাড়া পাওয়া গেল না, তখন পাঠালেন দ্বিতীয় আবেদনপত্র। একুশ হাজার লোকের তাতে স্বাক্ষর ছিল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষরকারী ছিলেন নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন। বিধবা বিবাহ আন্দোলনে তিনিই ছিলেন প্রবল বিরুদ্ধবাদী। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—যিনি বিধবা বিবাহ সমর্থন করেন নি, তিনি এই আন্দোলন সমর্থন করলেন।

এই নিয়েও আন্দোলন কম হলো না। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক রামনারায়ণ তর্করত্ন লিখলেন 'কুলীনকুল সর্বস্ব নাটক'। বিদ্যাসাগরই এই নাটক লেখায় তাঁকে উৎসাহ দিলেন। রামজয় বসাকের বাড়িতে নাটকের অভিনয় হলো।

সরকারী ভাবে বহু-বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে সরকারী সমর্থন পাওয়া গেল না। তখন বিদ্যাসাগর নিজেই নামলেন এই কাজে।

বল্লাল সেন যখন বাংলার রাজা, তখন তিনি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি জাতির মধ্যে যাঁরা নিষ্ঠাবান, বিদ্বান্, তপস্যা-দান ইত্যাদি গুণে গুণবান, তাঁদের নিজ নিজ সমাজের মধ্যে 'কুলীন' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। কিছুদিন পরে দেবীবর ঘটক সেই কুলীনদের মধ্যে 'মেল' বেঁধে দিয়েছিলেন। নীচু

ঘরে মেয়ের বিয়ে দিলে সমাজে পতিত হবে এই ভয়ে কন্যার পিতা কুলীন ছাড়া কাউকে কন্যা সমর্পণ করতেন না। সেই সুযোগ নিয়ে কুলীনদের মধ্যে অনেকে একাধিক বিয়ে করতে লাগলেন। এমনও দেখা যেত যে একটি কুলীন পাত্র ষাট সত্তরটি পর্যন্ত বিয়ে করতেন। বিদ্যাসাগর সেই 'মেল' প্রথা ভেঙে দিয়ে সাধারণ ভাবে বিয়ের প্রচলন করতে উদ্যোগী হলেন। ভাবলেন এই ভাবেই বহু-বিবাহ প্রথাও রদ হবে।

নানাভাবে সামাজিক উন্নতি বিধানের চেষ্টা করতে লাগলেন বিদ্যাসাগর। সুরাপান তখন সমাজকে কলুষিত করছিল। সেই সুরাপান বন্ধ করারও আন্দোলন তিনি করতে লাগলেন।

ষোল

বিদ্যাসাগরের জীবনে আর এক অতুলনীয় কীর্তি—মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউসন স্থাপন। তাঁর অক্লান্ত চেষ্টায় এবং উন্নত শিক্ষা পদ্ধতির গুণে মেট্রোপলিটন একটি উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয়ের মধ্যে পরিগণিত হলো। পরে ইস্কুলটি পরিণত হলো কলেজে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি পেয়ে এফ· এ· ক্লাস খোলা হলো। ১৮৭৪ সালে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মেট্রোপলিটনের এফ· এ· পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে সেই কলেজের ছাত্র যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। তাতে বিদ্যাসাগর খুবই আনন্দ এবং গর্ববোধ করেন। তিনি নিজে ঝামাপুকুর থেকে যোগেন্দ্রচন্দ্রকে ডেকে নিয়ে যান তাঁর বাদুড়বাগান স্ট্রীটের বাড়িতে। বিদ্যাসাগরের ঘরে আলমারিতে অজস্র মূল্যবান বই ছিল। তার থেকে তিনি সুদৃশ্য স্কটের গ্রন্থাবলী বের করে নিজের হাতে নাম লিখে প্রিয়তম ছাত্রকে উপহার দিলেন।

দিনে দিনে মেট্রোপলিটন কলেজের সুনাম বাড়তে লাগলো, ছাত্রও বাড়তে লাগলো। কয়েক বছরের মধ্যে মেট্রোপলিটন হয়ে উঠলো একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ। বি· এ· পরীক্ষার ক্লাসও খোলা হলো।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তখনও রাষ্ট্রগুরু হন নি, বয়সে তিনি যুবক। অন্যায়ভাবে তিনি সিভিল সার্ভিসের চাকরি থেকে বরখাস্ত হলেন। তখন বিদ্যাসাগর দুশো টাকা বেতনে সুরেন্দ্রনাথকে তাঁর কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করলেন। পরবর্তী কালে স্যার আশুতোষকেও তিনি এই কলেজে চাকরি দিয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগর বিদ্যালয়ে কখনো বেত ব্যবহার করা পছন্দ করতেন না। সংস্কৃত কলেজে একবার এক অধ্যাপকের টেবিলে একগাছি বেত দেখে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন—বেত কেন হে! অধ্যাপক জবাব দিয়েছিলেন—ম্যাপ দেখাবার এতে সুবিধা হয়। বিদ্যাসাগর তখন হাসতে হাসতে বলেছিলেন—কিন্তু সাবধান, এ বেত যেন ছাত্রের পিঠে না পড়ে।

ছাত্রদের তিনি বশ করতেন স্নেহের শাসন দিয়ে। স্কুলে বেত ব্যবহার করার প্রথা তিনি উঠিয়ে দিয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগরের আর একটি স্মরণীয় প্রচেষ্টা হলো—হিন্দু ফ্যামিলি

অ্যানুইটি ফান্ড স্থাপন। মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারে হিন্দু বিধবারা যেরূপ কষ্টভোগ করেন তা মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন তিনি। সামান্য রোজগার করে একজন মধ্যবিত্ত বাঙালী মৃত্যুকালে তাঁর পরিবারবর্গকে কিছুই দিয়ে যেতে পারেন না, তার ফলে বিধবা স্ত্রী ও পরিবারের নাবালক সন্তানরা কষ্টভোগ করে। তার প্রতিকারের উপায় চিন্তা করতে করতেই হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুইটি ফান্ডের পরিকল্পনা তাঁর মাথায় আসে।

নিয়ম করা হলো, প্রতি মাসে ফান্ডে দু টাকা চার আনা করে জমা দিতে হবে, মৃত্যুর পরে পিতা মাতা বা বিধবা স্ত্রী যাবজ্জীবন মাসে মাসে পাঁচ টাকা করে পাবে। ফান্ডে বেশী টাকা জমা দিলে সেই অনুপাতে বেশী টাকা পাবে।

এই ফান্ড প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, দ্বারকানাথ মিত্র, রায়বাহাদুর শ্যামাচরণ দে, পাইকপাড়ার কুমার গিরিশচন্দ্র সিংহ, কাশিমবাজারের মহারানী স্বর্ণময়ী, পুঁটিয়ার রানী শরৎকুমারী এবং আরও অনেকে। অনেকে এই প্রতিষ্ঠানের সাহায্যার্থে এককালীন মোটা টাকা দান করলেন।

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে একটি ট্রাস্ট গঠন করা হলো। তাঁরাই এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতেন। তিন বছর ফান্ডের কাজ বেশ শৃঙ্খলার সঙ্গে চলেছিল। কিন্তু তারপর পরিচালক মণ্ডলীর মধ্যে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ায় বিদ্যাসাগর বুঝতে পারলেন তাঁর দুর্নাম হবে। তাই এর সংশ্রব ত্যাগ করলেন।

বিদ্যাসাগর ছিলেন দয়ার সাগর। তাঁর দয়ার কাহিনী বিচিত্র ও অসংখ্য। দেশের সমস্ত দুঃখী লোকের কথা তিনি চিন্তা করতেন। একবার লুসিটেনিয়া জাহাজডুবিতে অনেক লোক মারা গেল। তার খবর শুনে বিদ্যাসাগর কেঁদে উঠলেন। বললেন—এই দুনিয়ার যিনি মালিক, আমাদের চেয়েও কি তিনি নিষ্ঠুর?

১৮৬৯ সালে বর্ধমানে ম্যালেরিয়া দেখা দিল। রোগের প্রকোপে পড়ে অনেক লোক মারা যেতে লাগল, আর কষ্ট পেতে লাগলো অগণিত শিশু, বৃদ্ধ, নারী। বিদ্যাসাগর খবর পেয়ে সেখানে চলে গেলেন। তাঁর কাজ হলো —গরিব দুঃখীর খবর নেওয়া, দোরে দোরে ঘুরে রোগীর ওষুধ আর পথ্যের ব্যবস্থা করা। এই সময়ে দেখা যেত কত রোগাক্রান্ত শিশুকে, কত অনাথ হিন্দু ও মুসলমানের ছেলেকে কোলে করে তিনি বেড়াচ্ছেন।

বাড়িতে মায়ের ব্যবহারের জন্য যা যা জিনিসের দরকার হতো, বিদ্যাসাগর তা কলকাতা থেকে পাঠিয়ে দিতেন। একবার ভগবতী দেবী বিদ্যাসাগরকে চিঠি লিখে জানালেন—বাড়ির জন্য ছ'খানা লেপ দরকার।

বিদ্যাসাগর ছ'খানা লেপ যথাসময়ে পাঠিয়ে দিলেন। একখানা লেপ নিজে রেখে ভগবতী দেবী আর পাঁচখানা বাড়ির লোকজনকে দিয়ে দিলেন।

কিছুদিন পর বিদ্যাসাগর বাড়ি এলেন। তখন সন্ধ্যা হয়েছে। ঘরে এসে দেখলেন মা নেই। খোঁজ নিয়ে জানলেন তিনি রান্নাঘরে উনুনের পাশে বসে আছেন। বিদ্যাসাগর সেখানে গিয়ে মাকে জিজ্ঞেস করলেন—মা, তুমি এখানে বসে আছ কেন?

ভগবতী দেবী বললেন—বড় শীত করছে বাবা। তাই উনুনের পাশে একটু বসে আছি। রাত্রে বড় শীত পড়ে, তাই যতক্ষণ পারি এইখানেই বসে থাকি।

বিদ্যাসাগর বললেন—সে কি, তোমার লেপ নেই? এই যে কিছুদিন আগে লেপ পাঠালাম।

মা বললেন—ছিল। সেদিন একটি বউ তার ছোট্ট ছেলেকে নিয়ে আমার কাছে এসেছিল, ওদের কষ্ট দেখে আমার লেপটি দিয়ে দিয়েছি।

সেকথা শুনে বিদ্যাসাগর হাসতে হাসতে বললেন—বেশ করেছ মা। এখন বল তো, ক'খানি লেপ হলে তোমার গায়ে একখানি লেপ জুটবে?

মা বললেন—তোর কলকাতা যাবার আগে ঠিক করে বলবো।

কলকাতা যাবার আগে ভগবতী দেবী ক'খানা লেপ দরকার তা বলে দিলেন। বিদ্যাসাগর তার চেয়েও একটি বেশী লেপ পাঠিয়ে মাকে চিঠি লিখে জানালেন—মা, তুমি যতখানা লেপ পাঠাতে বলেছিলে তার চেয়েও একখানা বেশী পাঠিয়েছি। আমার মনে হয় এবারে গায়ে একখানা লেপ জুটবে।

১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর। বাংলার প্রথম সাধারণ নাট্যশালা ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হচ্ছে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক। প্রথম অভিনয় রজনী—বিরাট হইচই। গিরিশচন্দ্র, নগেন্দ্রনাথ, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি প্রভৃতি অভিনেতাদের সমবেত প্রচেষ্টায় হচ্ছে নাটকের অভিনয়।

দীনবন্ধু মিত্র নিজে এসে বিদ্যাসাগরকে অনুরোধ করে গেলেন প্রথম রজনীর অভিনয়ে উপস্থিত থাকার জন্য। বিদ্যাসাগর গেলেন। তাঁকে দর্শকদের আসনে প্রথম সারিতে বসিয়ে দেওয়া হলো। ইংরেজ কুঠিয়াল রোগ্ সাহেবের ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি। অত্যাচারী কুঠিয়াল সাহেবের দুর্দান্ত প্রকৃতি তাঁর অভিনয়ে এমন প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল যে বিদ্যাসাগর বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি ভুলে গেলেন যে অভিনয় দেখছেন। তাঁর পা থেকে চটিজুতো খুলে কুঠিয়াল সাহেবের দিকে ছুড়ে মারলেন।

অমনি প্রেক্ষাগৃহে তুমুল উত্তেজনা শুরু হলো। কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হয়ে গেল অভিনয়। কুঠিয়াল-বেশধারী অর্ধেন্দুশেখরও হতভম্ব। কিন্তু

কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্যাপার বুঝে নিয়ে বিদ্যাসাগরের সেই চটি মাথায় তুলে অর্ধেন্দুশেখর বললেন—এই আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

একবার উড়িষ্যা ও বাংলায় দারুণ দুর্ভিক্ষ হয়। মেদিনীপুর জেলায়ও তা বিকটরূপ ধারণ করে। সে খবর শোনা মাত্র বিদ্যাসাগর চঞ্চল হয়ে উঠলেন। কলকাতা থেকে ভাই শম্ভুচন্দ্রকে লিখে পাঠালেন, 'যত টাকা ব্যয় হয় হউক, কেহ যেন অভুক্ত না থাকে।' তারপর নিজেই তিনি গিয়ে পৌঁছলেন বীরসিংহ গ্রামে। বীরসিংহ এবং আশপাশের দশ বারোটি গ্রামের লোকদের জন্য অন্নসত্র স্থাপন করলেন। সে ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের কত টাকা খরচ হয়েছিল এবং কত টাকা ধার করতে হয়েছিল তার কোন হিসেব নেই।

বাংলার বহু জমিদার ও সম্ভ্রান্ত রাজপরিবারের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের আলাপ ছিল এবং তাঁরা সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন। অনেকেই নানা কারণে বিদ্যাসাগরের কাছে কৃতজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু কারো কাছেই বিদ্যাসাগরের কোন প্রত্যাশা ছিল না। পাইকপাড়ার প্রতাপচন্দ্র সিংহ কয়েকবার তাঁকে টাকা ধার দিয়েছিলেন, তিনি তা শোধও করেছিলেন। কিন্তু প্রতাপচন্দ্র তখন জীবিত নেই। কাজেই বিদ্যাসাগরের খুব অসুবিধা হলো। ঋণজালে জর্জরিত হয়ে মুর্শিদাবাদের মহারানী স্বর্ণময়ীর কাছে সাড়ে সাত হাজার টাকা ধার চেয়ে চিঠি লিখলেন। স্বর্ণময়ী টাকা দিলেন। কথা মতো তিন বছরের মধ্যে বিদ্যাসাগর সেই টাকা শোধ করে দিয়েছিলেন। পাইকপাড়া রাজবাড়ির কোন মহিলাও সেই বিপদের সময়ে তাঁকে পঁচিশ হাজার টাকা ধার দিয়েছিলেন। সেই টাকাও শোধ করে দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর।

মিঃ হ্যারিসন ছিলেন ইনকামট্যাক্সের বড় অফিসার। তিনি একবার অফিসের কাজে মেদিনীপুর গিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর আগেই জানাশোনা ছিল। হ্যারিসন সাহেব মেদিনীপুর এসেছেন জেনে বিদ্যাসাগর তাঁর মাকে বললেন—মা, আমার এক বন্ধু সাহেব এসেছেন মেদিনীপুরে, খুব ভালো বাংলা বলতে পারেন।

ভগবতী দেবী তা শুনে বললেন—সাহেবকে একদিন খাবার নেমন্তন্ন করে নিয়ে আয় না। ছেলেটিকে আমি দেখবো।

বিদ্যাসাগর সে কথা হ্যারিসন সাহেবকে গিয়ে জানালেন। সাহেব বললেন —আমি যেতে পারি যদি আপনার মা নিজে আমাকে নেমন্তন্ন করেন।

ভগবতী দেবী তখন নিজের হাতে সাহেবকে একখানা চিঠি লিখে পাঠালেন। চিঠি পেয়ে সাহেব খুব খুশী। একদিন বিদ্যাসাগরের বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। ভগবতী দেবী সাহেবের জন্য অনেক রকম খাবার

তৈরি করে রেখেছিলেন। আসন পেতে সাহেবকে খেতে দিলেন। পাশে বসে সাহেবকে দেখিয়ে দিতে লাগলেন কোনটির পর কোনটি খেতে হবে। খেয়ে সাহেব খুব পরিতৃপ্ত হলেন। বিদ্যাসাগরকে বললেন—আপনার বাড়িতে এসে আপনাদের আতিথ্যে আর আপনার মায়ের আদর যত্নে আমি মুগ্ধ হয়েছি, একথা আমার চিরদিন মনে থাকবে।

ভগবতী দেবীকে হ্যারিসন সাহেব বললেন—মা, শুনেছি আপনার অনেক টাকা আছে। কত টাকা আছে বলুন তো!

ভগবতী দেবী বললেন—আমার চার ঘড়া ধন আছে বাবা।

বিদ্যাসাগর, দীনবন্ধু আর শম্ভু কাছেই বসেছিলেন। মায়ের কথা শুনে বিদ্যাসাগর একটু বিব্রত হয়েই বললেন—মা, তুমি কার কাছে কি বলছো। এ যে ইনকামট্যাক্সের সাহেব, টাকার ওপর ট্যাক্স ধরে।

ভগবতী দেবী হেসে বললেন—তাতে কি আছে। আমি তো চার ঘড়া ধন ঠিকই বলেছি।

হ্যারিসন সাহেব জিজ্ঞেস করলেন—কোথায় আছে চার ঘড়া?

ভগবতী দেবী দেখিয়ে দিলেন তাঁর তিন পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র, দীনবন্ধু ও শম্ভুচন্দ্রকে। বললেন—এই তো তিন ঘড়া। তারপর সাহেবের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললেন—আর এই আরেক ঘড়া।

জবাব শুনে সবাই স্তম্ভিত। সাহেব বিদ্যাসাগরের দিকে তাকিয়ে বললেন—এমন মা না হলে কি এমন ছেলে হয়!

বীরসিংহের বাড়িতে একদিন ঠাকুরদাস স্বপ্ন দেখলেন—তাঁদের বাড়ি পুড়ে গেছে—পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রের অনেক রকম বিপদ ঘটছে—ভাইদের সঙ্গে ঈশ্বরের বনিবনাও হচ্ছে না—বন্ধুদের সঙ্গেও বিচ্ছেদ ঘটছে। স্বপ্ন দেখার পর ঠাকুরদাসের মন খুব খারাপ হয়ে গেল। তিনি সব ছেড়ে কাশীবাস করবার ইচ্ছা করলেন। সে খবর পেয়ে বিদ্যাসাগর বাড়ি এলেন—বাবাকে অনেক বুঝালেন। কিন্তু কিছুতেই ঠাকুরদাসের মন পরিবর্তন হলো না। তখন শুভদিন দেখে বিদ্যাসাগর বাবা আর মাকে নিয়ে কাশী যাত্রা করলেন।

একদিন কাশীতে তাঁরা গিয়েছেন বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা দর্শন করতে। পাণ্ডারা বিদ্যাসাগরকে জানতো। তাই দর্শনী চাইলে অনেক টাকা। কিন্তু বিদ্যাসাগর অত টাকা দর্শনী দিয়ে বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা দর্শন করতে চাইলেন না। পাণ্ডারা বলল—তা হলে কি আপনি বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা মানেন না?

রিদ্যাসাগর বাবা ও মার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললেন—এঁরাই আমার বিশ্বনাথ আর অন্নপূর্ণা।

কাশীতে বাবার থাকবার একটা ব্যবস্থা করে বিদ্যাসাগর মাকে নিয়ে

কলকাতায় চলে এলেন। কিন্তু পিতাকে ফেলে আসার জন্য মন খুব খারাপ হয়ে গেল।

নানাকারণে বিদ্যাসাগরের পারিবারিক জীবনে খুব শান্তি ছিল না। তাঁর পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে হরচন্দ্র আর হরিশচন্দ্র অল্প বয়সেই মারা যায়। তারা দুজন ছিল সবার চেয়ে ছোট। বিদ্যাসাগর তাদের খুব ভালবাসতেন। লেখাপড়া শেখাবার জন্য তাদের কলকাতায় নিজের কাছে এনে রেখেছিলেনই। দীনবন্ধু, শম্ভু ও ঈশান এই তিন ভাইকেও তিনি কলকাতায় রেখে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। তাঁদের দুটি বোনও ছিল। অল্প বয়সেই তাদের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল।

বিদ্যাসাগরের নিজেরও বিয়ে হয়েছিল খুব অল্প বয়সেই। বিয়ের প্রায় ষোল বছর পরে তাঁর প্রথম পুত্র নারায়ণচন্দ্রের জন্ম হয়। নারায়ণচন্দ্রই তাঁর একমাত্র পুত্র। তারপর তাঁর চারটি মেয়ে হয়। হেমলতা, কুমুদিনী, বিনোদিনী ও শরৎকুমারী। স্ত্রী দীনময়ী পুত্রকন্যাদের নিয়ে বেশির ভাগ সময়েই বীরসিংহের বাড়িতে বাস করতেন। খুব প্রয়োজন হলে বিদ্যাসাগর তাদের কলকাতায় আনতেন। বিদ্যাসাগর শিক্ষা দীক্ষা ও সামাজিকতায় যেমন অগ্রসর ছিলেন, স্ত্রী দীনময়ী ছিলেন তার বিপরীত। এজন্যই দাম্পত্যজীবন তাঁদের খুব সুখের হয় নি।

বিদ্যাসাগর বুঝতে পেরেছিলেন—পরিবারের বহু লোক এক সঙ্গে থাকলে নানারূপ অসুবিধা ঘটে এবং অশান্তি হয়। তাই তিনি সহোদর ভাইদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা বাড়ি করে দিলেন আর তাঁদের খরচ চলবার জন্য মাসিক সাহায্য দেবারও ব্যবস্থা করলেন। এত সব করেও কিন্তু সংসারে শান্তি আসে নি।

এর ওপর আবার ঘটলো এক অঘটন। ঠাকুরদাসের দেখা স্বপ্ন সত্য হলো। চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিন রাত দুপুরে বীরসিংহের বাড়িখানা পুড়ে গেল। কলকাতায় খবর গিয়ে পেঁছতেই বিদ্যাসাগর বীরসিংহে এলেন। মাকে বললেন—মা, চলো সবাই মিলে কিছুদিন কলকাতায় গিয়ে থাকি।

কিন্তু ভগবতী দেবী গ্রাম ছেড়ে যেতে রাজী হলেন না। বললেন—আমার বাড়িতে যে সব গরিব ছেলেরা থেকে পড়াশোনা করে তারা কোথায় যাবে! তাছাড়া প্রতিবেশীদের অসুবিধা হবে খুব।

গ্রামের অনেকে বিদ্যাসাগরকে পাকা বাড়ি করবার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর বললেন—গরিব বামুনের পাকা বাড়ি দেখলে লোকে হাসবে যে। কোন রকমে মাথা রাখবার মত একটু ঠাঁই হলেই হলো।

আবার নতুন করে বাড়ি তোলা হলো। সমস্ত খরচ বহন করলেন বিদ্যাসাগর। কলকাতার বাদুড়বাগানে তখনো তিনি বাড়ি করেন নি। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতেই তখনো থাকতেন।

কিছুদিন পর বিদ্যাসাগর শুনলেন ক্ষীরপাই-এর মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় এক বিধবাকে বিয়ে করবেন। সেই বিয়েটা হবে বীরসিংহ গ্রামে। বিদ্যাসাগর সেই বিয়ের ব্যাপারে খুবই উৎসাহী হলেন। কিন্তু বীরসিংহের অনেক সম্ভ্রান্ত লোক তাঁকে এই বিয়েতে যোগ দিতে নিষেধ করলেন। বিদ্যাসাগর দেখে বিস্মিত হলেন, যাঁরা আগে ছিলেন বিধবা বিবাহের পৃষ্ঠপোষক তাঁরাই এখন বিরোধিতা করছেন। তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি বললেন—এই বিয়ে হবে না। বর কনেকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়া হোক।

কিন্তু সেদিন রাত্রেই দীনবন্ধু আর শম্ভুচন্দ্রের চেষ্টায় অন্য এক বাড়িতে সেই বিয়ে হয়ে গেল। পরদিনই কুৎসা রটনা হতে লাগলো—বিদ্যাসাগরই গোপনে এই বিয়ের অনুষ্ঠান করেছেন। সে কথা শুনে বিদ্যাসাগর ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন—'আর এ গ্রামে থাকবো না।'

বিদ্যাসাগর পরদিন সকালবেলা অভুক্ত অবস্থায় বীরসিংহ ত্যাগ করলেন। আর কখনো তিনি জন্ম-ভিটায় ফেরেন নি।

ভাইদের জন্য এত করতেন, অথচ তাঁদের কাছ থেকেও বিদ্যাসাগর ভাল ব্যবহার পান নি। মেজ ভাই দীনবন্ধু প্রেসের ও বইয়ের দোকানের অংশ দাবি করলেন। কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী তিনি অংশ পেতে পারেন না। দীনবন্ধু মামলা করতে চাইলেন। শেষে ব্যাপারটি সালিসিতে দেওয়া হলো। সালিসিদের বিচারে দীনবন্ধুর দাবি টিকলো না। তখন ভাইয়ে ভাইয়ে মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। তবু বিদ্যাসাগর তাঁর কর্তব্য করতে ত্রুটি করেন নি। ভাইয়ের বউকে গোপনে গোপনে সংসার খরচের টাকা দিয়ে বললেন—এই নাও, দীনুকে বলো না। আমি জানি তোমাদের কষ্ট হচ্ছে। যা হোক কোনরকমে এই টাকায় খরচ চালাও।

দীনবন্ধুর কষ্টের মাত্রা দিনদিনই বাড়তে লাগলো। দাদার সাহায্য নেবেন না ভেবেছিলেন—কিন্তু শেষে দাদার শরণাপন্ন হলেন। বিদ্যাসাগর কিছুদিন চেষ্টা করে ছোটলাটকে বলে দীনবন্ধুকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি যোগাড় করে দিলেন।

কিছুদিন পর খবর এল কাশীতে ঠাকুরদাসের ভয়ানক অসুখ। বিদ্যাসাগর মাকে নিয়ে কাশীতে চলে গেলেন। চিকিৎসা ও সেবাযত্নে ঠাকুরদাস অল্পদিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠলেন। বিদ্যাসাগর ও ভগবতী দেবী দুজনেই ঠাকুরদাসকে দেশে ফিরে আসার জন্য অনুরোধ করলেন, কিন্তু ঠাকুরদাস রাজী হলেন না। তখন মাকে বাবার কাছে রেখে বিদ্যাসাগর কলকাতায় ফিরে এলেন।

দীনবন্ধু এবং শম্ভুচন্দ্রও কাশীতে গিয়েছিলেন, ভগবতী দেবী তাঁদের সঙ্গে কয়েকটি তীর্থ ঘুরে বেড়ালেন। তারপর ফিরে এলেন কলকাতায়।

এর কিছুকাল পর বিদ্যাসাগর পেলেন একটি শোকের আঘাত। বড়

মেয়ের স্বামী গোপালচন্দ্র সমাজপতি বিয়ের এক বছরের মধ্যেই মারা গেলেন। বিদ্যাসাগর প্রাণের চেয়েও ভালবাসতেন বড়মেয়ে হেমলতাকে। কন্যার বিধবার বেশ দেখে পিতার মনে কান্না উথলে উঠতো। মেয়েকে সাদা ধুতি পরতে দেখে আর হবিষ্যি করতে দেখে তিনি মাছ খাওয়া ছেড়ে দিলেন। শেষে অনেকদিন পর কন্যার বিশেষ অনুরোধে আবার মাছ খাওয়া ধরলেন।

১২৭৭ সাল। খবর এল কাশীতে ঠাকুরদাস আবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। বিদ্যাসাগর মাকে নিয়ে আবার চললেন কাশীতে। সেবাযত্নে এবারও ঠাকুরদাস সুস্থ হয়ে উঠলেন। মাকে রেখে বিদ্যাসাগর ফিরে এলেন কলকাতায়। কিন্তু দুমাস যেতে না যেতেই চৈত্রসংক্রান্তির দিন ভগবতী দেবী হঠাৎ কাশীতে দেহ রাখলেন। খবর পেয়ে শিশুর মত কাঁদলেন বিদ্যাসাগর। মায়ের শ্রাদ্ধ-শান্তি সমাধা করলেন। পুরো এক বছর হবিষ্যি করে, জুতো চাদর ছেড়ে, ছাতা মাথায় না দিয়ে একবেলা খেয়ে কাটালেন মায়ের ওপর শ্রদ্ধা জানাবার জন্য।

এর পাঁচ বছর পরে ১২৮৩ সালের ১লা বৈশাখ ঠাকুরদাসও কাশীতে দেহরক্ষা করলেন। সেই সময়ে বিদ্যাসাগর ও তাঁর ভাইয়েরা সকলেই ছিলেন কাশীতে। তাঁরাই বাবার মৃতদেহ বহন করে নিয়ে মহাশ্মশান মণিকর্ণিকার ঘাটে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করলেন।

কলকাতায় ফিরে আসার পর বিদ্যাসাগর খুবই নিঃসঙ্গ বোধ করতেন। পিতামাতা দু'জনেই চলে গেছেন—তাঁর শক্তিও যেন কমে গেছে।

অপরের কষ্ট মোচন ও সুখ বিধানের জন্য বিদ্যাসাগরের চিন্তার অবধি ছিল না। অথচ নিজে থাকতেন অতিশয় কষ্টে। শেষ জীবনে তাঁকে গুরুতর পরিশ্রম করতে হয়েছে। এজন্য চিকিৎসকরা তাঁকে কিছুদিন কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। প্রথমে দেওঘর থাকবেন বলে বাড়িও দেখেছিলেন কিন্তু দাম বেশী বলে কিনতে পারেন নি। শেষে সাঁওতাল পরগনায় কার্মাটারে একটি ছোট বাড়ি তৈরি করালেন। বন-জঙ্গলের মধ্যে অতি নিভৃত পরিবেশে মাঝে মাঝে তাঁর বেশ ভালোভাবেই দিন কাটতো।

কলকাতার বাদুড়বাগানে বাড়ি করার পর বিদ্যাসাগর কিছুদিন শান্তিতে বাস করেছিলেন। মেয়েদের তাঁর বাড়িতে এনে রাখতেন। সন্ধ্যার সময় তিনি মেয়েদের আর তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে তাঁর বসবার ঘরে বসে গল্প-গুজব করতেন। বিদ্যাসাগর পান খেতেন খুব। নাতিরা চাইতো দাদুর চিবানো পান। তিনি পান দিয়ে তাদের খুশী রাখতেন। নাতিদের দেবার জন্য নতুন চকচকে টাকা, আধুলি, সিকি, দু-আনি, পয়সা সব সময় কাছে রাখতেন। নাতিরা এমনকি মেয়েরা যে যখন চাইতো তাদের দিতেন। বিদ্যাসাগর নাতিদের জিজ্ঞেস করতেন—দাদা, বল তো তোমরা কাকে ভালবাসো। তারা

জবাব দিত—দাদু, তোমাকে খুবই ভালবাসি, আর তোমার চেয়ে ঐ নতুন সিকি দু-আনিকে আরো ভালবাসি। দাদু তখন রসিকতা করে বলতেন—ঠিক বলেছো, সকলেই তাই। তোমরা সরল তাই বলে ফেলেছো। অপরে কিন্তু এমন স্পষ্ট করে বলে না।

বিদ্যাসাগরের তখন খুব নাম-ডাক। চার দিকেই শোনা যায় বিদ্যাসাগর—বিদ্যাসাগর। সেই সময়ে একবার তিনি গেছেন হুগলী জেলার এক গ্রামে স্কুল দেখতে। অনেক লোক পথের দুধারে বিদ্যাসাগরকে দেখবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের ছাদ, দরজা, জানালা, গাছতলা কোন জায়গা ফাঁকা নেই।

এক বৃদ্ধা এত ভিড় দেখে জিজ্ঞেস করলো—এত লোক কেন গো? কে আসবে?

লোকেরা বলল—বিদ্যাসাগর আসবেন। বৃদ্ধা বিদ্যাসাগরের নাম শুনেছিল, কিন্তু চোখে দেখে নি। তাই সেও ভিড়ের মাঝে একটু জায়গা করে দাঁড়িয়ে পড়লো। কিছুক্ষণ পরেই সাড়া পড়ে গেল—বিদ্যাসাগর আসছেন—বিদ্যাসাগর আসছেন। বিদ্যাসাগর এলেন—সেই জনতার ভিতর দিয়ে চলেও গেলেন। পুরুষরা প্রায় সবাই চিনতে পারলো বিদ্যাসাগরকে, কিন্তু মেয়েদের মধ্যে অনেকেই চিনতে পারে নি। তারা মনে করেছিল বিদ্যাসাগর বোধহয় সাহেব-সুবোদের মত হ্যাট্-কোট পরা লম্বা চওড়া মানুষ। কিন্তু তাঁর যে অতি সাধারণ পোশাক। তাই মেয়েরা অনেকেই বুঝতে পারে নি। বৃদ্ধার অবস্থাও তাই। ভিড় যখন কমে যেতে লাগলো তখন সে জিজ্ঞেস করলো—হ্যাঁ গা, বিদ্যেসাগর আসে নি? একজন লোক বললো—কেন, ঐ তো চাদর গায়ে দিয়ে তিনি চলে গেলেন।

বৃদ্ধার তবু বিশ্বাস হয় না। শেষে মুখ সিঁটকে বললো—আ আমার পোড়া কপাল! এ আবার কি বিদ্যাসাগর! গাড়িও নেই, ঘড়িও নেই, চোগা চাপকানও নেই। এ কী...চেহারা!

একবার বিদ্যাসাগর বিশেষ একটি কাজে এলাহাবাদ গিয়েছিলেন। এলাহাবাদ স্টেশনে তাঁর জন্য লোক আসবার কথা ছিল। কিন্তু যে ট্রেনে তাঁর যাবার কথা ছিল তার আগের ট্রেনে তিনি গিয়েছেন, কাজেই লোক তখনো এসে পেঁছোয় নি। হাতে ছিল তখন অনেক সময়, তাই বিদ্যাসাগর স্টেশনের প্লাটফরমে পায়চারি করতে লাগলেন।

এমন সময় একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেন এসে দাঁড়ালো। একটি কামরা থেকে নামলেন এক যুবক, ফুটফুটে চেহারা, ফিটফাট পোশাক, হাতে একটি সুটকেস। নেমেই 'কুলী কুলী' করে ডাকতে লাগলেন। কিন্তু বেশী কুলী সেখানে ছিল না। যুবক কুলী না পেয়ে সুটকেসটা হাতে নিয়ে বড় অসহায় বোধ করতে লাগলেন। বিদ্যাসাগর তা বুঝতে পেরে হিন্দীতে জিজ্ঞেস করলেন—কাঁহা জানে হোগা বাবু?

যুবক বললেন—এই গাড়ি-বারান্দা। বিদ্যাসাগর যুবকের ব্যাগটি হাতে নিয়ে তাঁর সঙ্গে স্টেশনের গাড়ি-বারান্দায় পেঁছলেন। সেখানে গিয়ে দেখা গেল এক্কা, টাঙ্গা কোন গাড়িই নেই। যুবক তখন ভারী মুশকিলে পড়ে গেলেন। বিদ্যাসাগর হিন্দীতেই আবার জিজ্ঞেস করলেন—আপকা ঘর কাঁহা হ্যায়? যুবকটি কিন্তু বাংলাতেই বললেন—আমাদের বাড়ি সাগঞ্জে—খুব কাছেই।

বিদ্যাসাগর তখন সুটকেসটি আবার হাতে তুলে বললেন—চলিয়ে বাবু। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁরা সাগঞ্জে পেঁছলেন। বিদ্যাসাগর সুটকেসটা যুবকের হাতে দিলেন। যুবক মনিব্যাগ খুলে একটা দু-আনি তাঁর হাতে দিতে গেলে বিদ্যাসাগর বললেন—এ পয়সায় আমার দরকার নেই বাবু। কোন গরিব দুঃখীকে পয়সাটা দান করে দেবেন।

কুলীর মুখে পরিষ্কার বাংলা কথা শুনে যুবক অবাক্। জিজ্ঞেস করলেন—তোমার বাড়ি কোন্ জেলায়?

—মেদিনীপুর।

—তুমি কুলীর কাজ করো কেন?

কুলীর কাজ করি নে। দেখলাম আপনি এই ছোট সুটকেসটা বয়ে আনতে কষ্ট পাচ্ছেন, তাই আমি বয়ে এনে দিলাম।

বলেই বিদ্যাসাগর পথ চলতে লাগলেন। কাছেই এক বাড়ির বারান্দায় এক যুবক দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি মেট্রোপলিটন কলেজ থেকে পাস করে আইন পড়ে এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালতি করছেন। তিনি ছুটে এসে বিদ্যাসাগরের পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন। তাঁকে দেখেই বিদ্যাসাগর বলে উঠলেন—শঙ্কর, তুই এখানে?

যুবক বললেন—আমি এখানে হাইকোর্টে ওকালতি করি। আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দিলে ধন্য হবো।

বিদ্যাসাগর বললেন—আমি এলাহাবাদে কয়েকদিন থাকবো। পরে আবার তোর সঙ্গে দেখা হবে। আমি তোকে খবর পাঠাবো। বলেই হনহন করো বিদ্যাসাগর চলে গেলেন।

এমন সময় যাঁর সুটকেস বিদ্যাসাগর বয়ে এনেছিলেন—সেই যুবক ছুটে এসে জিজ্ঞেস করলেন—ঐ লোকটি কে?

—বিদ্যাসাগর।

যুবক এমন লজ্জা পেলেন, যা কোনদিন পান নি। এমন শিক্ষা পেলেন যা কোনদিন ভোলেন নি। ছুটে গিয়ে বিদ্যাসাগরের কাছে ক্ষমা চাইলেন। বিদ্যাসাগর বললেন—নিজের কাজ যতটা পারো নিজেই করবে। অপরের আশায় থেকো না।

বিদ্যাসাগর অনেকগুলি বিধবার বিবাহ দিলেও জীবনে খুব তৃপ্তি লাভ করেন নি। সমালোচনা ও নানা অশান্তিকর পরিস্থিতির হাত থেকে কখনো মুক্তি পান নি। তবে শান্তিলাভ করেছিলেন নিজের ছেলে নারায়ণচন্দ্রের সঙ্গে এক বিধবার বিয়ে দিয়ে। খানাকুল কৃষ্ণনগরের শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা ভবসুন্দরী ছিল বাল-বিধবা। বয়স মাত্র তেরো বছর। তাঁর সঙ্গে নারায়ণচন্দ্রের বিয়ে দিলেন। বিয়েতে বাড়ির সকলেরই অমত ছিল। কিন্তু পুত্রের ইচ্ছায় আর বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় বিয়ে হলো। পাত্র-পাত্রীকে কলকাতায় এনে রাখা হয়েছিল মীর্জাপুরে কালীচরণ ঘোষের বাড়িতে। সেখানেই হলো বিয়ে। এই বিয়ের ব্যাপারে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন—এর চেয়ে সৌভাগ্যের বিষয় আমার আর কিছুই হতে পারে না।

বিদ্যাসাগরের জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সঙ্গে যোগাযোগ। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে যোগাযোগ যাঁর ঘটেছে তিনিই নিজেকে ধন্য মনে করেছেন। কিন্তু ঠাকুর নিজের ইচ্ছায় এসেছিলেন বিদ্যাসাগরের বাড়িতে এটাই আশ্চর্য ব্যাপার। একদিন পরমহংসদেব তাঁর ঘরে বসে আছেন, শিষ্যরা তাঁর চারদিকে বসে আছে। হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন—চলো, একবার বিদ্যাসাগরকে দেখে আসি।

শিষ্যরা অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—হঠাৎ বিদ্যাসাগরকে দেখবার আপনার ইচ্ছা হলো কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ মধুর হেসে বললেন—জানো, বিধাতার অনুগ্রহ ছাড়া তাঁর মতো মহাপুরুষ পৃথিবীতে আসেন না।

ঠাকুর দেখতে চেয়েছেন, কাজেই আর অবহেলা করা চলে না। দিন স্থির হয়ে গেল। বিদ্যাসাগরকে জানিয়ে দেওয়া হলো রামকৃষ্ণদেব বিকেলবেলা তাঁর বাড়িতে যাবেন।

যথাসময়ে শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। বিদ্যাসাগর আগেই প্রস্তুত হয়ে ছিলেন। ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করার যথাযথ আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু নির্দিষ্ট আসনে না বসে ঠাকুর বিদ্যাসাগরের কাছে এসে একটি আসনে বসে পড়লেন। বললেন—খানা-ডোবা-খাল-বিল পার হয়ে এবার 'সাগরে' এসে পড়লাম।

বিদ্যাসাগর সে কথা শুনে বললেন—এসেই যখন পড়েছেন তখন তো আর উপায় নেই, দু-এক ঘটি নোনা জল তুলে নিয়ে যান। এ সাগরে নোনা জল ছাড়া আর কিছুই পাবেন না।

পরমহংসদেব বললেন—সাগর তো কেবল নুনেরই নয়—লবণেক্ষু-সুরা-সর্পী-দধি-দুগ্ধ-ঘৃতাদয়ঃ—এই সাত সাগর ছাড়া আরো তো অনেক সাগর আছে! তুমি তো আর অবিদ্যার সাগর নও—তুমি যে বিদ্যার সাগর! এ

সাগরে রত্নই আছে। এসেছি যখন, তখন রত্নই নিয়ে যাবো। নোনা জল তুলবো কেন?

এমন তাৎপর্যময় কথা শুনে উপস্থিত সকলেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন। পরমহংসদেব আরো বললেন—বিদ্যাসাগর, তোমার কর্ম সাত্ত্বিক কর্ম। সত্ত্বগুণ আসে দয়া থেকে। তুমি যে বিদ্যা দান করছো—অন্নদান করছো, সেও তো দয়া থেকে। তোমার দয়া নিস্কাম দয়া। যারা নামের জন্য দয়া দেখায়—তাদের দয়া তো নিষ্কাম নয়। তোমার দয়ায় কামনা নেই। তুমি তো সিদ্ধপুরুষ।

শুনেই বিদ্যাসাগর চমকে উঠলনে। বললেন—আপনি একি বলছেন? আমি সিদ্ধপুরুষ! ভগবানের জন্য সাধনা আমি করলাম কবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন—সিদ্ধপুরুষ তোমায় অমনি বলি নি। জান তো, আলু পটল সিদ্ধ হলে নরম হয়ে যায়। তুমিও তো তেমনি নরম হয়ে গেল। পরের কষ্ট দেখলে তোমার মন গলে যায়। তোমার এত দয়া! তুমি সিদ্ধ নও তো আর কাকে সিদ্ধপুরুষ বলবো?

ঠাকুরকে খাওয়াবার জন্য বিদ্যাসাগর বর্ধমান থেকে সীতাভোগ ও মিহিদানা আনিয়েছিলেন, তা ছাড়াও আনিয়েছিলেন ভাল ভাল মিষ্টি। নিজের হাতে বিদ্যাসাগর ঠাকুরের সামনে তা তুলে ধরলেন। খেয়ে ঠাকুরের কি আনন্দ, কি তৃপ্তি!

ঠাকুর খেতে খেতে কত গল্প করলেন। বললেন—বিদ্যাসাগর, তুমি দরকাঁচা পণ্ডিত নও তো! শকুনি খুব উঁচুতে ওঠে, কিন্তু তার নজর পড়ে থাকে ভাগাড়ের দিকে। যারা শুধু পণ্ডিত, তারা নামেই পণ্ডিত,—সংসারে তাদের ঘোর আসক্তি; নিজেদের নিয়েই তারা ব্যস্ত। তাদের মন শকুনির মতো খোঁজে কেবল ভোগের ভাগাড়। তুমি সে-রকম নও, তোমার মধ্যে আছে বিদ্যার ঐশ্বর্য-দয়া-ভক্তি-বৈরাগ্য।

বিদ্যাসাগরকে অনেক বলতেন নাস্তিক। তিনি নাকি ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন না। তবে একথা সত্য ধর্মের ওপর তাঁর দুর্বলতা ছিল না। ঈশ্বরের সেবার চেয়ে মানুষের সেবাই তিনি বড় বলে মনে করতেন। মানুষের সেবা করাই ছিল তাঁর বড় ধর্ম। তাই তিনি জাতি-বিচার কিছু না করে হাড়ি-ডোম-দুলে যে কেউ অসুখে পড়ে আছে খবর পেলে ছুটে যেতেন। ওষুধের ব্যবস্থা করতেন, পথ্যের ব্যবস্থা করতেন। অতিথি-সেবাও ছিল তাঁর কাছে পরম ধর্ম।

সাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে একবার কয়েকজন ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিলেন—বিদ্যাসাগরের ধর্মমত কি?

বিজয়কৃষ্ণ বলেছিলেন—বোধোদয়ের মতই তাঁর ধর্মমত। বিদ্যাসাগর নিজের ধর্মমত বা বিশ্বাস কারুর কাছে প্রকাশ করতে চাইতেন না।

বিদ্যাসাগর ছিলেন স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও আত্মবিশ্বাসী পুরুষ। তাই কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছিলেন—

"নিঃস্ব য়ে বিশ্বে এলে দয়ার অবতার,
কোথাও তুমি নোয়াও নি শির জীবনে একবার।"

বিশ্বের কল্যাণের জন্যই বিদ্যাসাগরের জন্ম। অপরের সুখের জন্য নিজের সুখ জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন। শেষ বয়স পর্যন্ত তাঁকে করতে হয়েছিল অক্লান্ত পরিশ্রম। প্পারিবারিক জীবনে যতটুকু সুখ ছিল তা-ও বেশীদিন রইলো না। পত্নী দীনময়ী দেবী ১২৯৫ সালের ১লা ভাদ্র পতি পুত্র কন্যা সকলকে রেখে অকালে পরলোকে চলে গেলেন।

বিদ্যাসাগরের শরীর অতিরিক্ত পরিশ্রমে অনেকদিন থেকেই ভেঙে পড়েছিল। তার ওপর পত্নীশোক পেয়ে আরও শরীর ভেঙে পড়লো।

১২৯৭ সাল থেকেই বিদ্যাসাগর রোগে জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে পড়তে লাগলেন। দু বছর করলেন রোগের সঙ্গে যুদ্ধ। সুদক্ষ চিকিৎসকদের চিকিৎসাতেও কোন ফল হলো না। শেষে এলেন বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাঃ সালজার। তাঁর চিকিৎসায় প্রথম প্রথম একটু ভালই মনে হলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুফল হলো না।

জীবন মৃত্যুর সঙ্গে চললো প্রচণ্ড সংগ্রাম। দেহ অস্থিসার হয়ে গেল।

মুখে মৃত্যুর ছায়া অথচ সে-মুখের ভাব একটুকু বিকৃত নয়। দৃষ্টি নিবন্ধ দেয়ালে টাঙানো দুখানি ছবির দিকে। তাঁর চির-আরাধ্য জনক-জননীর ছবি।

বেজে উঠলো বিদায়ের সংকেত ধ্বনি...। ১২৯৮ সালের ১৩ই শ্রাবণ ...রাত্র গভীর...চারদিক ঘোর অন্ধকার। সেই বিষাদের অন্ধকারেই দেশকে ঢেকে চলে গেলেন বিদ্যাসাগর।

সমাপ্ত